উলামায়ে কেরাম

সূচীপত্র

‘দুআ কেন্দ্রবিন্দুয় সবার লক্ষ্য’ বইটির ব্যাপারে
মতামত ও সুপরামর্শ

শেখ রাহমাতুল্লাহ শামসী
প্রধান শিক্ষক মাদ্রাসা মোহাম্মাদিয়া
নূরপূর, বীরভূম

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم و بعد:

সম্মানীয় লেখক---‘দুআ কেন্দ্র বিন্দুয় সবার লক্ষ্য’!

আপনার বইটি পড়ার পর আমার একটি পরামর্শ। আপনার ও অন্যান্যদের মতই আমিও ফারেগ হওয়ার পর থেকে ফরয নামায পর ইমাম মুক্তাদী মিলে দুআ করার পক্ষে ছিলাম। কুলশুনা মাদ্রাসায় কর্মরত অবস্থায় শুনলাম, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলানা শাহিদুল্লাহ সাহেব কুলশুনার জামে মাসজিদে ঐভাবে জামাআতী মুনাজাত করা বিদআত বলেছিলেন। তারপর শুনলাম, হাফেয শায়খ আইনুল বারী সাহেব মেটিয়াব্রুজের হাওলদার পাড়ার জামে মসজিদে ও আহলে হাদীস পত্রিকায় উক্ত প্রকার জামাআতী মুনাজাতকে বিদআত বলেছিলেন। তখনও আমি ঐ বিদআত বলার বিপক্ষে। বঙ্গের স্বনামধন্য কুলশুনার মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ রাহেমাহুল্লার লাইব্রেরী থেকে প্রাপ্ত মৌলানার ফাতওয়ার জামাআতী মুনাজাত জায়েয-এর উর্দুর বাংলা করেছিল কুলশুনা কল্যাণ ঘর থেকে, মাওলানার ছেলে তা প্রকাশ করেছিলেন। তারপর মাঠপলসা মাদ্রাসায় থাকা কালীনও জামাআতী দুআর পক্ষেই ছিলাম। তখন সারা বঙ্গে দুআ করা ও না করা নিয়ে তোলপাড়। কত ইমামদের চাকরিও চলে যাচ্ছিল। কত মুনাযারা-মুবাহাসা শুনতে পাচ্ছিলাম। আমাদের দেশের মদীনা ফারেগ মৌলানারা এ বিষয়ে সকলে একমত এবং আমাদের দেশের কতিপয় আলেম মাদানীদের সহমত অবলম্বন করেছেন। বাকী আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাঘা-বাঘা আলেম ভিন্ন মতের। তাঁরা জামাআতী দুআর পক্ষপাতী। তখন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারপর সৌভাগ্যক্রমে মাঠপলসা মাদ্রাসায় পৌঁছে গেল ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য কিতাবগুলি। তার মধ্যে ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ

(সম্পূর্ণ), আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহেমাহুল্লাহ)র ইরওয়াউল গালীল, সিলসিলাতুল আহাদীসিস যায়ীফা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিতর্কিত মুনাজাতের মাসআলাগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম। ঠিক ঐ সময়ে ঐ বিতর্কিত মাসআলার একটি ৫ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ শায়খ উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী রহঃ-এর বের হল মুহাদ্দিস পত্রিকায় জামেয়া সালাফিয়াহ বানারস থেকে। মারহুম ফরয নামাজ পর জামাআতী মুনাজাতের সপক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা করার পর সব শেষে মন্তব্য দিয়েছিলেন, 'ফরয নামায পর ইমাম-মুক্তাদী মিলে দুআ করা বা করতে হবে মনে করা' না জায়েয, বরং বিদআত। এই সব জানার পর জামাআতী মুনাজাত বিদআত জেনে একেবারে তা ছেড়ে দিলাম। আমার চরম আশা ছিল যে, 'দুআ কেন্দ্র বিন্দুয় সবার লক্ষ্য'-এর লেখক মাওলানা আব্দুল হাকীম সাহেবও জামাআতী মুনাজাত করার তাবলীগ ও বই লেখালেখি আমার মতই ছেড়ে দেবেন। কিন্তু দেখছি, না। মাওলানার ঘোর কাটছে না।

মাওলানা আতাউল্লাহ সাহেব (রহঃ) নুরপুর-ওলাদের আহবানে নুরপুর এসে মাওলানা মোকাম্মাল হকের বাড়িতে সউদী আরবের কিতাবের ভান্ডারে বসে মওলানা মোকাম্মেল হকের ও আমার সঙ্গে কিতাব দেখা-দেখি ক'রে আলোচনা-পর্যালোচনা এমনকি হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম হওয়ার পর ৪/৫ ঘন্টা আমাদের সমস্ত দালায়েল শুনে ও দেখে, দেখলাম যে, তাঁরও ঘোর কাটল। ঘোর কাটিয়ে দিলেন মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব নুরপুরীরও। আল্লাহ তাঁদেরকে হেদায়াত করলেন। এরপর থেকে তাঁরা দুআ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করলেন না। কিন্তু অন্তরে দুআর মহব্বত প্রবল ছিল।

চরম দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আমাদের জামাআতী লোক হয়েও মাওঃ আঃ হাকীম সাহেবের জামাআতী দুআর মোহ কাটছে না। দিন দিন যেন ঐরূপ দুআর ঠিকেদারী নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছেন তিনি।

জনাব মাওলানা! আপনার লেখা বইগুলি আমি সব পড়েছি। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক দলীল আসল কিতাবে খুঁজে খুঁজে বের করেছি। তাতে যা দেখলাম, আপনি যেন সাঁওতালদের মত মদে মত্ত, দুধের স্বাদ বুঝানো আপনাকে অসম্ভব। কারণ, আপনি সব বইয়ে রামপুকুরের রেজিষ্ট্রী দলীল দেখিয়ে মোড়লপুকুর দখল করতে চাচ্ছেন। তারই প্রেক্ষিতে মাওঃ আব্দুল হামীদ মাদানীর তথ্য সরবরাহে মাওঃ আব্দুল্লাহ সালাফী সাহেবের সংকলনে সংকলিত 'বিতর্কিত জামাআতী মুনাজাত ও

মাগরিবের পূর্বে দু রাকআত নফল' (যে বইটি আপনার 'সালাতে হাকিম ঃ দুআয়ে হাকীম' ও আপনার মত দুআ-পাগল মাওলানা মাঝহারুল ইসলাম সাহেবের প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোয়া'র জবাবী বই) লেখা হয়েছে। তাতে আপনাদের উপস্থাপিত মাসআলাকে ধরে ধরে একটি একটি ক'রে বড় আমানতদারীর সাথে প্রতিবাদ ও খন্ডন করা হয়েছে। যেখানে আপনারা নেশায় মত্ত হয়ে সমাজের নিরীহ মানুষদেরকে বিপথগামী করার অপচেষ্টা করেছেন। কোথাও এতবড় বিতর্কিত মাসআলাকে নাবালিকা মেয়ের পুতুলকে বৌ সাজিয়ে ঘর-কন্যা করার ন্যায় সমাজকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সালাফী সাহেবের জবাবী বই প্রকাশ হওয়ার পর শিক্ষিত লোকদের নিকট ও একটু প্রাথমিক ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের নিকট আপনাদের স্বরূপ ও বিদ্যার দৌড় সূর্যালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে গেছে। যদিও দু-চারটি আলেম মনে মনে দুআ করা ভাল---এই মত পুষে রেখেছিলেন, তাঁদেরও মনের পরিবর্তন এসেছে।

জনাব মৌলানাদ্বয় একবার বাড়ি থেকে বের হন, কেবল নিজের এলাকার হানাফী গ্রামগুলির সমীক্ষা নিয়ে সরলমতী মানুষদেরকে বাঁকা পথ দেখাবেন না। পশ্চিমবঙ্গের যে যে জেলার মাওঃ আব্দুল্লাহ সালাফী সাহেবের প্রতিবাদী 'বিতর্কিত জামাআতী মুনাজাত' বই পৌঁছে গেছে সেখানকার আলেম-উলামা ও তোলাবাদের মাঝে কি বিপ্লব ঘটেছে একবার দেখে আসুন।

আর সাবধান! এরপর আর 'প্রতিবাদের প্রতিবাদ' বের করতে যাবেন না। ভেবেছিলেন, 'দুআয়ে হাকিম ঃ সলাতে হাকিম' বইয়ের তো পূর্ণ খানা-তল্লাশী করে পোষ্টমার্টম হয়ে গেছে, তাই ফের নূতন নামে নূতন সাজে 'দুআ কেন্দ্র বিন্দুয় সবার লক্ষ্য' বই লেখে সমাজকে বস্তাপচা আরো একটি উপহার দেওয়া যাক। কিন্তু জেনে রাখুন, لكل فرعون موسى

মাআয আল্লাহ! আস্তাগফিরুল্লাহ! ছোট ছোট নাবালেগ ছেলে-মেয়েরা আপোসে মারামারি ক'রে যখন হেরে যায়, তখন সেই চিৎপাত হারা ছেলে-মেয়েরা প্রতিপক্ষকে কি বলে প্রতিশোধ নেয় জানেন তো? হ্যাঁ খুব ভাল জানেন, আপনারও আমল আছে। তাই 'দুআ কেন্দ্র বিন্দুয়' বইয়ের ৬০ পৃষ্ঠায় আব্দুল হামীদ মাদানী ও আব্দুল্লাহ সালাফী সম্পর্কে ঐ না বালেগ ছেলে-মেয়ের মত চরম পরাস্ত হয়ে কি ভাষা প্রয়োগ করলেন! বিদ্বানে বিদ্বানে বিদ্যার লড়াই হবে। বিদ্যা না থাকলে তখন এরূপ অভদ্রোচিত অমার্জিত ভাষা প্রয়োগ হবে কেন? হায় রে আলেম, হায় রে

ধর্মীয় লেখক, হায় রে বিতর্কের পন্ডিত! সমাজে আপনার ওজন কোথায় পৌঁছল---তা একবার সমাজকে জিজ্ঞাসা করুন। মনে হয় আপনি কি 'মুনাযারাহ রাশীদিয়্যাহ' বই পড়েন নাই। না পড়ে থাকলে পড়ে নেবেন একবার।

আচ্ছা মাওলানা! আপনার নিকট একটু জানতে চাই, দুআ কেন্দ্র বিন্দুয়' বইটি ছাপানোর পর ঐ তিনটি অভিমত সংগ্রহ করেছেন, নাকি বই ছাপার আগেই অভিমতগুলি পেয়েছেন? মনে হয় প্রথমটিই ঠিক। তা নাহলে আপনার সম্পূর্ণ বইটিতে জামাআতী মুনাজাত অকাট্য প্রমাণ করতে হবে---এরই অপচেষ্টা। অথচ অভিমত-প্রত্যায়নে লেখক মাওলানা সুলতান আহমাদ শামসী অভিমত পেশ করলেন, ফরয নামায বাদে হাত তুলে যৌথ দুআয় প্রাচীন ও অধুনা আহলে হাদীস উলামাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদে মতভেদ আছে। কিন্তু এই অভিমতের একটু আলোক-ছায়া তো আপনার বইয়ের ভিতর কোথাও নেই। বরং বলতে চেয়েছেন, আমরা---মানে বীরভূমের ৪টি মলবী ও মুর্শিদাবাদের ৭টি মলবী আমরা দুআ করছি ও করব। ভারী সুন্দর শ্লোগান! মাওলানা সুলতান শামসী অভিমত দিলেন যে, 'মাগরিবের ফরয নামাযের পূর্বে দু'রাকআত নামায মানসুখ, এতে আমার সহমত নাই।' আরও বললেন, 'ঐ দু'রাকআত নফল নামায সাবেত আছে।' অথচ আপনি ঐ বইয়ে মাগরিবের ফরযের আগে দু'রাকআত নফল নামাযকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। বড় আশ্চর্য ব্যাপার!! এ ক্ষেত্রে আপনার জামাআতী দুআর প্রধান দলীল মুবারকপুরীর ফাতওয়াও অগ্রাহ্য করেছেন।

ভাই! এক কথায় আপনি এমন এক জন্ডিসে আক্রান্ত। জন্ডিসে শুধু আপনার চোখ হলুদ হয় নাই; বরং আপনার সারা শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলুদ হয়ে গেছে। এমনকি মস্তিস্কও জর্জরিত। তা না হলে আপনি বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) সম্পর্কে না জায়েয শব্দগুলি প্রয়োগ করতে পারেন। আশ্চর্য! এতে আপনার কলম কাঁপল না!? আত্মসমীক্ষা করুন? দেশে আপনার স্থান কোথায়? পশ্চিমবঙ্গে কতজন মানুষ আপনাকে মানে? ক'জনই বা আপনাকে ডাকে? ক'জন আপনার কাছে আসে? শামীম সাহেবের পরিচয় ছাড়া কতজনই বা আপনাকে চেনে? লক্ষ লক্ষ চামচিকা যদি সূর্যের আলোকে না দেখে, তাতে সূর্যের মান মর্যাদার কিছু হানি হবে না। কো-এডুকেশন স্কুলে সারা জীবন মাষ্টারি ক'রে কাটালেন, আজ আবার মুহাদ্দিসানা চাল কেন? আত্মসমীক্ষা করুন, নেকীর ভান্ডারে কত প্লাস-মাইনাস ঘটেছে, তা দেখুন। আপনি আবার সমাজকে

হাদীস কুরআনের উপদেশ দেবেন? এ যেন 'ভুতের মুখে রাম নাম'-এর নামান্তর। শ্রদ্ধেয় মাওলানা! আপনার ঐ প্রসঙ্গের বইগুলি যেন ইবলিসের সার্কুলার।

'ওহ্ ফাকাহ কাশ কেহ্ মাওত সে ডারতা নেহী যারা,
রূহে মুহাম্মাদ (সঃ) উসকে বাদান সে নিকাল দো।'

অর্থ, মৃত্যু-ভয়হীন বেচারা গরীব মুসলিমদের দেহ মন থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবন্ত আদর্শকে বের ক'রে ফেল। *(আল্লামা ইকবাল)*

অর্থাৎ, মহা নবীর মহব্বত ও আদর্শকে তাদের মন থেকে বের ক'রে দাও---এই কথাটিই প্রমাণিত হচ্ছে।

পরিশেষে দুআ করি, ওগো আল্লাহ! আমাদেরকে সুমতি দান কর। যে যুগে আমরা ৮০ পার্সেন্ট মুসলমান বেনামাযী, তাদের নামাযী বানানোর চেষ্টা না ক'রে নামাযের পর দুআ করা ও না করাকে কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে আপোসের ইজ্জত হরণ করা-করি থেকে বাঁচিয়ে নাও। আল্লাহ! আমাদেরকে হেদায়াত কর। আমীন!

وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين.

মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক নুরপূরী, বীরভূম
ফাযেল, আলিয়া মাদ্রাসা, কলকাতা বোর্ড
ফযীলত, মাদ্রাসা আরাবিয়াহ দারুল হুদা, মাঠপলসা
ফযীলত, ফাইযে আম, মৌনাথ ভঞ্জন, ইউ-পি
অনার্স তাফসীর-হাদীস, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়ায, সউদী আরব
উচ্চ এরাবিক ডিপ্লোমা কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়ায, সউদী আরব
কর্মরত কিং আব্দুল আযীয একাডেমি উয়ায়নাহ, রিয়ায, সউদী আরব

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

আল্লাহ তা'আলার শত-কোটি প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে বিবেকবান মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। রাসূল প্রেরণ করে সকল প্রকার শির্ক বিদআত হতে সকর্ত করে কেবল তাওহীদ ও সুন্নতের অনুসারী করেছেন। অতঃপর শত-কোটি শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আমাদের শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার এবং সাহাবাগণের উপর।

এর পূর্বে একটি পুস্তিকা (সালাতে হাকীম দোয়া-য়ে হাকিম) পাঠ করেছিলাম। তারপর (স্বলাত শেষে বিতর্কিত জামাআতী মুনাজাত ও মাগরিবের পূর্বে দু'রাকআত নফল, মাওলানা আব্দুল হাকীম ও মাঝহারুল ইসলাম সাহেবানের জবাবী বই)ও পাঠ করেছি। এরপর 'দুআ কেন্দ্রবিন্দুয় সবার লক্ষ্য' বইটিও পাঠ করলাম।

প্রথম বইটি পড়ে মনে হয়েছিল, বই লেখা প্রাক্টিস করছেন তিনি, তাই ভুল সংশোধন করে দেওয়া উচিত। কিন্তু বিতর্কিত বিষয়ে না লেখে অন্য বিষয়ে লেখা তাঁর জন্য ভাল ছিল। পরের বইটি পাঠ করে যা বুঝতে পেরেছি, ইনসাফের সাথে তার কিছু নমুনা পাঠকগণের সমীপে উল্লেখ করছি ঃ-

১। মোটা করে শিরোনাম দিয়েছেন এবং তাতে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, সেগুলোর উপর পাঠক ভরসা করতে পারে না। কারণ, নিজ ইচ্ছামত ওয়ায করে গিয়েছেন, মূল গ্রন্থের যে ভাষা তা উল্লেখ করেননি। আপনি খেসারির সাথে হ্যাঁটকা মিশিয়ে চালাচ্ছেন কি না পাঠক কেমন করে জানবে? এটি একটি দ্বীনী আমানত, আমানতদারীর সাথে মূল গ্রন্থের ভাষা উল্লেখ করে তার সঠিক অনুবাদ তুলে ধরা উচিত।

২। শিরোনাম নির্ধারণ করে নিজ মতলব এমনভাবে এক তরফা আলোচনা করেছেন যাতে পাঠকগণ ধোঁকা খাবেন। কোন স্থানে এমন শিরোনাম দেখলাম না যে, তাতে বিপক্ষের এই দাবী তাদের এই দলীল, আপনি তা উল্লেখ করছেন। অথচ, তাদের দাবী ও দলীল অধিক শক্ত। আপনি দুআর পক্ষে শায়েখ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)এর ফতোয়া উল্লেখ করে সুরুত করে পাশ কাটিয়ে গেলেন। তিনি বিপক্ষের দাবী ও দলীল উল্লেখ করেছেন, আপনি দ্বীনের খাদেম কেন তা উল্লেখ করলেন না? তোহফাতুল আহওয়াযী কেবল আপনার কাছে আছে? আমাদের কাছে নেই? চালাকী করে যাবেন কোথায়?

৩। কোন কোন স্থানে প্রসঙ্গ ছাড়া কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে নিজের পাতে ঝোল ঢেলেছেন। যেমন এই আয়াতটি,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (١٨٦) سورة البقرة

অর্থ, আমার বান্দা যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, (তখন আপনি বলে দিন) নিশ্চয় আমি নিকটে আছি, দুআকারীর দুআ কবুল করি, যখন সে আমার নিকট দুআ করে। *(সূরা বাকারাহ ১৮৬ আয়াত)*

এখানে আল্লাহ সাধারণভাবে দুআর কথা বলেছেন। ফরয স্বলাতের পর প্রচলিত দুআর কথা কোথায় বলেছেন? ফরয স্বলাতের পর দুআ করতে নিষেধ নেই বলে আপনি আম আয়াতকে নিজের খেয়াল-খুশী মত ফরয স্বলাতের পর খাস করে দিলেন! উক্ত আয়াতে কোন জায়গায় দুআ করতে নিষেধ নেই বলে, আপনি চায়ের দোকানে, গ্রামের ক্লাবে, আমতলা, জামতলা, তালতলা সর্বস্থানে প্রচলিত দুআ করেন না কেন? যাঁরা ঐ প্রচলিত জামাআতী দুআ প্রমাণ করতে চান, তাঁদের অধিকাংশ উক্ত আয়াটিকে পেশ করে থাকেন। আয়াতটির অবতীর্ণ প্রসঙ্গ হচ্ছে;

إن أعرابيًا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ } تفسير ابن كثير / دار طيبة - (١ / ٥٠٦)

অর্থ, জনৈক বেদুঈন বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের রব কি নিকটে যে তাঁকে চুপিচুপি ডাকবো, নাকি তিনি দূরে তাই তাঁকে উচ্চ স্বরে ডাকবো? তারপর তিনি নীরব থাকলেন, অতঃপর উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল। *(তাফসীর ইবনে কাসীরঃ দারু তাইবাহ ১খঃ ৫০৬ পৃঃ)*

যাঁর উপর আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে তিনি তো আপনার মত ব্যাখ্যা দেন নি? সুতরাং আপনার এটি ব্যক্তিগত তাফসীর, আপনার তাফসীর ছাড়া কোন তাফসীরের কিতাবে প্রচলিত দুআর উল্লেখ নেই। নিজ মতলব হাসেলের জন্য যে খেলা খেলতে আরম্ভ করেছেন, তাতে বাতিলদের পথ প্রশস্ত করছেন। তারাও বলে, মীলাদ অনুষ্ঠানের প্রমাণ কুরআনে আছে। দলীল,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ, হে মু'মিনগণ! তোমরা তাঁর (নবী ﷺ)-এর উপর দরূদ পড়। *(আহযাব ৫৬ আয়াত)* তারাও বলে জামাআতবদ্ধভাবে দরূদ পাঠ উক্ত আয়াতে প্রমাণিত হচ্ছে। কারণ, তাতে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং সকলে মিলে জামাআতবদ্ধভাবে দরূদ পাঠ করা জায়েয। এভাবে অনেক আমল জামাআতবদ্ধভাবে করার প্রমাণ হয়ে যাবে। যেমন,

{فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ....} (٣) سورة النساء

{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٢٢٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, মেয়েদের মধ্যে যাকে পছন্দ তাকে তোমরা বিবাহ কর। (নিসা ৩ আয়াত)

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত স্বরূপ, অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন কর। *(বাকারাহ ২২৩ আয়াত)*

আপনার কথা মত এই আয়াতগুলি থেকে জামাআতবদ্ধভাবে বিবাহ ও সহবাস করার কথাও প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং একটু হুঁশ করে কথা বলুন।

৪। আপনার বইটিতে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তাকে এক নম্বরের ককটেল বলা যেতে পারে। কারণ তাতে সহীহ যয়ীফ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, আম-আমড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেননি। যেগুলো আলাদা করার জন্য ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ, গবেষকগণ জীবন ভর শ্রম দিয়ে গিয়েছেন, সেগুলিকে আপনি পরোয়া না করে নিজের গান গেয়েছেন।

৫। কোন কোন স্থানে জনগণের সাথে প্রতারণা করেছেন অথবা লেজ তুলে না দেখেই হুকুম চালিয়ে দিয়েছেন। ৫১নং শিরোনাম 'ফল কথা ঃ আইনুল বারী'। এখানে তাঁর পূর্বের ফতোয়া উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি উদার মনে পরে সংশোধন করে নিয়েছেন সেটি উল্লেখ তো করেননি। শায়খ আইনুল বারী সাহেব (আইনী তুহফা স্বলাতে মুস্তফা) দ্বিতীয় খন্ড ২৪৮-পৃঃ শেষের তিন লাইনে প্রচলিত দুআ একেবারে বর্জন করার কথা বলেছেন। এখানে গভীর জলের মাছ আর ভেসে বেড়ানো চুনোপুঁটির পার্থক্য বুঝা যাচ্ছে। আপনি জেনে-শুনে শায়খ আইনুল বারী সাহেবের কথা গোপন করেছেন অথবা তিনি যে প্রথম ফতোয়া থেকে রুজু করেছেন, তা আপনি জানেন না। তাই আমি কানাকে হাতি দেখানোর মত ফতোয়া না দেওয়ার জন্য নসীহত করছি।

অনুরূপ শায়খুল হাদীস আব্দুর রঊফ শামীম সাহেবেরও পূর্বের ফতোয়া নকল করেছেন। অথচ তিনিও পরবর্তীতে রুজু করে নিয়ে ফরয সালাতের পর জামাআতী

দুআ বিদআত বলেছেন। অথচ তাঁকেও সুযোগ-সন্ধানী বানানো হয়েছে!

৬। আপনার তথ্য পরিবেশনায় গভীরতা, সূক্ষ্মতা, প্রামাণিকতা, ধারাবাহিকতা এবং দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করলাম না। কেবল লম্বা ওয়াযের মাধ্যমে ঝাল মিটিয়েছেন। জাহাজের ডানা, সাইকেলের চাকা এবং গো গাড়ির টপ্পর দিয়ে যানবাহন তৈরী করলে যেমন দেখাবে, তেমনি আপনার তথ্য পরিবেশনেরও অবস্থা।

৭। হাদীস থেকে জামাআতী দুআর ফতোয়া দেওয়ার পূর্বে সঠিকভাবে হাদীসের পরিভাষা জানা প্রয়োজন, তা না হলে যেমনি বাঁকা প্রেম তেমনি বাঁকা ইঁট তৈরী হবে। আপনি অনেক স্থানে 'সিহাসিত্তা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ, ছ'টি সহীহ হাদীসের গ্রন্থ ঃ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ। তার অর্থ হল উক্ত গ্রন্থে যত হাদীস আছে তা সবই শুদ্ধ। সহীহ না হলে এত বড় মুহাদ্দিস তাঁর গ্রন্থে স্থান দিলেন কেন? আপনাদের এই ধারণা থাকার কারণে দুর্বল হাদীসের উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দেন। অথচ বুখারী-মুসলিম ছাড়া অন্য গ্রন্থগুলোতে দুর্বল হাদীসও আছে, যা মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ গ্রন্থে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করেছেন। বুখারী-মুসলিমকে সাহীহায়ন বলা হয়, বাকী চারটিকে সুনানে আরবাআহ বলা হয়। ছ'টি গ্রন্থকে এক সঙ্গে বলতে হলে, 'কুতুবে সিত্তা' বলতে হয়। অন্য দিকে আবার 'হাদীস কাকে বলে' তার পরিচ্ছেদ বেঁধেছেন!?

৮। আপনি দ্বীনী মাসআলায় তর্ক আরম্ভ করেছেন, দুআর মত ইবাদত, ফরয স্বলাতের পর জামআতবদ্ধভাবে প্রমাণ করবেন। তার জন্য আপনাকে বলিষ্ঠ দলীল পেশ করতে হবে। দলীলের মহব্বত থাকতে হবে, কুরআন ও হাদীসের মহব্বতের কথা বলতে হবে। নবী ﷺ ব্যতীত কোন ব্যক্তির কথা বা কর্ম দলীল হতে পারে না। কোন ব্যক্তির অন্ধ তাকলীদ করা বৈধ নয়। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, আপনি ৫৪ নং শিরোনামে লেখেছেন, 'মাওলানা উবাইদুল্লাহ রাহমানী মুবারকপূরী রহঃ আমার দলীল।' একটু জ্ঞান করুন, কি বলছেন একটু খেয়াল করুন। তর্ক করতে গিয়ে হিতে বিপরীত করে ফেলছেন যে। একেই বলে, কেঁচো তুলতে কেওটে তুলা। বাত ভাল করতে গিয়ে কুষ্ঠ ব্যাধি তৈরী করা। রাসূল ﷺ আমার দলীল এ কথা বলার তাওফীক হল না? কেমন মুসলমান আপনি!?

৯। ১৩নং শিরোনাম ঃ 'অনেকে দুআ করতে মানা করে' এখানে সবার চোখে বালি ছিটিয়ে পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। যারা ঐ প্রচলিত দুআ করে না তাদেরকে আবু জাহলের দলে ভর্তি করে দিয়ে খুব বাহাদূরী দেখালেন। কথায় বলে 'চোরের

মায়ের ডাগর গলা।' আপনার প্রমাণ ভঙ্গির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। এ যেন তাল গাছের উপর হাঁড়ি চড়িয়ে নীচে আগুন জ্বালিয়ে ভাত রান্নার মত। আপনি কাদের সঙ্গে বিতর্ক শুরু করেছেন খেয়াল আছে তো? এরা কচি-কাঁচা শিশু নাকি যে, এদের হাতে লাড্ডু দিয়ে ভুলাবেন?

{أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى} (١٠) سورة العلق

অর্থাৎ, আপনি তাকে দেখেননি, যে বান্দাকে বাধা দেয়, সে যখন স্বলাত আদায় করে। ক্ষেত্র বিশেষে স্বলাতের অর্থ দুআ হয়; প্রচলিত জামাআতী দুআ নয়। কিন্তু উক্ত আয়াতে (صلى) এর অর্থ দুআ নয় বরং প্রকৃত স্বলাতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

... وكان فيما ذُكر قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا محمد أبا جهل الذي يَنْهاك أن تصلي عند المقام، وهو مُعرض عن الحقّ، مكذّب به. ..... تفسير الطبري - (٢٤ / ٥٢٣) وكان في صلاة الظهر».

تفسير العز بن عبد السلام (٨ / ٦١)

অর্থাৎ, ...তার (আবু জাহলের) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে রাসূল ﷺ-কে স্বলাত আদায় করতে বাধা দিয়েছিল। তার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি কি আবু জাহলকে দেখেন নি, যে আপনাকে মাকামে ইব্রাহীমের নিকটে স্বলাত আদায়ে বাধা দেয়? সে সত্য থেকে বিমুখ এবং সত্যকে মিথ্যাজ্ঞানকারী......। *(তাফসীরে ত্বাবারী)* তাফসীরে ইয ইবনে আব্দুস সালামে উল্লিখিত হয়েছে, তখন তিনি (নবী ﷺ) যোহরের স্বলাত আদায় করছিলেন।

আপনি যাদেরকে আবু জাহলের দলভুক্ত করতে চেয়েছেন তারা কখনও সে রকম নয়। বরং আবু জাহলের বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে বিদ্যমান তারা আবু জাহলের দলভুক্ত। আবু জাহল সত্য হতে বিমুখ ও সত্যকে মিথ্যাজ্ঞানকারী। আপনিও সত্যকে গোপন করে স্বলাতের ব্যাখ্যা দুআ করেছেন!!!!

১০। আপনার বইটিতে অনেক স্থানে শাব্দিক ভুল রয়েছে। দু/চার জায়গায় হয় সে কথা আলাদা, সে ভুলের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া হল। কিন্তু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও ব্যক্তির নামও ভুল করেছেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী) তুহফাতুল আহবুযী, ইযালাতুল খুফা, অসিয়ারো আলা মিন নোবালা, আল জারহু অয়াত তাআজীল' লিখেছেন,

(কিরমানী) না লেখে (কারমানী) লেখেছেন। কিরমানী আপনার কিতাবে স্থান পেয়েছেন দলীল হিসাবে যিনি একজন প্রসিদ্ধ গোঁড়া হানাফী ছিলেন, তা জানেন কি? তিনি আরবীতে বই লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু যেখানে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর কথা হাদীসের বিপরীতে গিয়েছে, সেখানে তিনি বলেছেন, 'আমরা ইমাম আবু হানীফার কথা গ্রহণ করব। কারণ, আমাদের ইমাম সে হাদীসটিও জানতেন।' আমার মনে হচ্ছে আপনি মূল আরবী গ্রন্থটি পড়েননি। কারোর কাছে ধার করে লেখেছেন। সেই জন্য আপনার এই অবস্থা।

১১। যেখানে আপনি 'দুআ' শব্দ দেখেছেন, সেখান থেকে সেটিকে বিতর্কিত দুআয় ফিট করে দিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফার কোন এক ভক্ত খুব খুশী হয়ে বললেন, 'ইমাম আবু হানীফার নাম কুরআনেও আছে।' তাঁকে বলা হল, 'কোথায়?' তিনি বললেন,

{قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (৯৫)

আপনার ব্যাপারটাও তাই হয়েছে। যেখানে আপনি আমীন শব্দ দেখেছেন, সেটিকেও বিতর্কিত দুআয় সেট করেছেন।

১২। আপনার বইটিতে গবেষণামূলক তথ্য প্রত্যক্ষ করলাম না; অথচ এটি ইলমী আলোচনা। আপনি যা পেয়েছেন, তাই ঝেঁটিয়ে জড় করেছেন। আরবীতে বলা হয় **حاطب ليل** নিশির কাঠুরী, সে রাতের আঁধারে যা পায়, তাই বাঁধে। নিজের বোঝায় কি বাঁধল, সাপ না কাঠ---কিছুই টের পায় না। বাংলায় বলে, 'আঁধার ঘরে সাপ ধরা।' আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (٤٢) سورة البقرة

অর্থ, তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না এবং হককে গোপন করো না। অথচ তা তোমরা জান।

১৩- আপনার বইটির ৩৩ পৃষ্ঠায় লেখেছেন, 'একটা কথা মনে রাখতে হবে- সীহা-হ সীত্তার ইমা-মগণ, তারা যে যে হাদীসগুলি বাছাই করে নিজ নিজ হাদীস গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন, তা তাঁদের মনোনীত বলেই মনে হয়?'

বাঃ মৌলানা! বুখারী-মুসলিম ছাড়া অন্য চারজন মুহাদ্দিসগণ তাঁদের গ্রন্থে সব হাদীসকে মনোনীত ও সহীহ বলে মনে করেন নি; বরং অনেক ক্ষেত্রে হাদীসের পরম্পরা সম্পর্কে কথা বলেছেন; ভাল করে পড়ে দেখুন।

'মনোনীত বলেই মনে হয়' বাক্য দ্বারা কি হাদীসের হুকুম লাগানো যায়? পৃথিবীর একজন প্রসিদ্ধ হাদীস গবেষক, যাঁর অবাক করা গবেষণা, তাঁকে আপনি ফুঁক মেরে উড়িয়ে দিলেন?! ঐ ধরণের অবজ্ঞার কথা আপনি আপনার বইটির ৪৫ পৃষ্ঠায় লেখেছেন, 'যাকে নিয়ে এত হৈ-চৈ' 'হা-শা লিল আলবানী'!!! আপনার নিকট তাঁর জ্ঞানগর্ভ গবেষণার কিছুই মূল্য নেই। আর আপনি কুতুবে সিত্তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গবেষণা নয়, উক্ত গ্রন্থসমূহের হাদীসের যে হুকুম লাগানো আছে, সেগুলো জানার জন্য কি একবারও নজর ফিরিয়েছেন? আপনার গবেষণা 'তা তাদের মনোনীত বলেই মনে হয়'। এই তো আপনার দৌড়। কোথায় গান্ধিজী, আর কোথায় পিঁয়াজি। বায়োন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর শখ!? আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খোঁজ কেন?

১৪। আপনার গ্রন্থে বিপরীতমুখী কথা রয়েছে। যেমন ৫৪ পৃঃ ৭৩নং শিরোনামে যে তথ্য পেশ করেছেন। 'অনুরূপ দুআ এবং যাওয়া-য়েদে রাওয়া-তেবা বা বাড়তি আমল যা নাবীকৃত আচরণ তাতো সাব্যস্ত আছেই। এখন সেগুলো কাজে লাগানো মোস্তাহা-ব। অধিকাংশ আলেম ও শায়েখদের অভিমত তাই।'

২১পৃঃ ১৭নং শিরোনাম দিয়েছেন, 'নামায শেষে দুআ না করলে নামায অসম্পূর্ণ।'

এখন আমার কথা প্রশ্ন ঃ আপনার কাছে দুআ করা রুকন; যা বর্জন করলে নামায বাতিল হয়ে যায়, না ওয়াজেব; যা বর্জন করলে নামায অসম্পূর্ণ হয়, নাকি মুস্তাহাব? কোন্‌টি???

১৫। ৪৭ পৃঃ ৬১নং শিরোনাম দিয়েছেন, 'বাঁশের চেয়ে কন্‌চি দড়ো।' এটি আপনার জন্যই অধিক প্রযোজ্য। কারণ,

ক) শায়েখ সুলতান আহ্‌মাদ শামসী সাহেবের নিকট অভিমত নিয়েছেন ঠিক; কিন্তু মাগরিবের পূর্বে দু'রাকআত স্বলাতের ফতোয়ায় তিনি আপনার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। তারপরও গোঁড়ামি ছাড়েন নি!। শায়েখ আইনুল বারী সাহেব তিনি সত্যকে গ্রহণ করেছেন। কারণ, তিনি জ্ঞানী ও প্রসিদ্ধ আলেম। আর আপনি পারলেন না। আপনি কত মোটা বাঁশ যে, হকের সামনে মচকে যেতে পারলেন না, ভেঙ্গে যাওয়া তো দূরের কথা!! তাহলে কে দড়ো হল বাঁশ না কন্‌চি?

১৬। ১৬ পৃঃ ৩নং শিরোনাম দিয়েছেন, 'দুআয় যারা বিমুখ'। তারপর লেখেছেন, 'দুআরূপ ইবাদত করতে যারা বিমুখ হয়। তারা অতি সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ

করবে।' আপনি এখানে দু'টি জালিয়াতি করেছেন;

ক) কুরআনের আয়াতের সাথে আপনার শিরোনামের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ আপনি ধোঁকা দিয়ে শিরোনাম দিলেন!!

খ) কুরআনের আয়াতের অর্থে জালিয়াতি করেছেন, 'দুআরূপ ইবাদত করতে যারা বিমুখ হয় তারা অতি সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' কুরআনের আয়াতে 'দুআরূপ' শব্দ কোথাও আছে কি? যেখানে শব্দ যোগ না করলে অনুবাদ অসম্পূর্ণ থাকে সেখানে না হয় যোগ করা যায়। কিন্তু যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে যোগ করার উদ্দেশ্য কি ? সেটি হলো মাথায় যে ভুল ধারণা আছে তা শুদ্ধ প্রমাণ করা। পাঠকবৃন্দের নিকট আয়াত উল্লেখ করছি আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} (٦٠) سورة غافر

অর্থ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য কবুল করব। যারা আমার ইবাদত হতে অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা অতি সত্বর নিকৃষ্ট অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

কোন কোন তাফসীরে (ادعوني) শব্দের অর্থ সাধারণ দুআ করা হয়েছে, সেখানে প্রচলিত জামাআতী দুআর কথা উল্লেখ নেই। তাফসীর বাগাবীতে এভাবে এসেছে,

{ وقال ربكم ادعوني استجب لكم } أي: اعبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم وأغفر لكم، تفسير البغوي - (٧ / ١٥٦)

অর্থ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, অর্থাৎ, আমার ইবাদত কর, অন্যের নয়। তোমাদের ইবাদত কবুল করব, সওয়াব দেব এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করব। *(তাফসীরে বাগাবী ৭/১৫৬ পৃঃ)* এই তাফসীর অনুযায়ী, (ادْعُونِي) শব্দের অর্থ দুআ করাও নয় বরং ইবাদত করা। প্রচলিত দুআর প্রমাণে মাকড়সার জালের মত শক্ত আলোচনায় প্রচলিত দুআ বর্জনকারীদেরকে এমনভাবে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দিলেন যে, মনে হচ্ছে উক্ত আয়াতটি আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে!! জনাব থুথু দিয়ে ময়দা ভিজানো যায় না।

১৭। আপনি ৪৫ পৃষ্ঠায় লেখেছেন, 'কেবল একজন মুহাদ্দিস, যাকে নিয়ে খুব হৈ চৈ।

তিনি, আবুল ফারাজ ইবনে জাওযীর মত খোঁচা মেরে, দোষ ধরে, উক্ত হাদীসটি উচ্ছেদ করতে চেয়ে, নিজে সিকাহ-আস্থাভাজক (?) সেজে ইসলা-মে ফাটল ধরাতে চেয়েছেন -- আর তিনি হচ্ছেন, আ-ল্লা-মাহ মুহাম্মাদ না-সিরুদ্দীন আল-বানী।'

আমি বলি, আপনাকে নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছে না কেন? তিনি হৈ চৈ-এর যোগ্য বলেই তাঁকে নিয়ে হৈ চৈ করা হয়। আপনাকে নিয়ে হৈ চৈ করব, যদি তাঁর মত খেদমত দিতে পারেন! অপরের দেখে চড়চড়ানি করলে চলবে? কথায় বলে, 'কোকিলের ডাক শুনে কাক জ্বলে হিংসেয়।'

উল্লিখিত ভাষ্যে দু'জন বিখ্যাত পন্ডিত, ইসলামের খাদেম বহু গ্রন্থ-প্রণেতাদ্বয়কে ভালভাবে না জেনে আন্দাজে বললেন, 'তাঁরা ইসলামের ফাটল ধরাতে চেয়েছেন!' তাঁদের লেখা এত কিতাব, তথ্যমূলক গ্রন্থ ও ফতোয়া আছে সেগুলো পাঠ করা তো দূরের কথা সেগুলোর নাম পর্যন্ত জানেন না। এ সত্ত্বেও আপনার কাছে তাঁদের কোন মূল্য নেই! আসলে যারা ডাক্তারের মর্যাদা জানে না তারা বাহ্যিকভাবে মনে করে, ডাক্তাররা লোকের গায়ে সুই ফুঁড়ে বেড়ান! এ রকম অধিকাংশ শিশুরা মনে করে থাকে। কিন্তু তাঁরা যে সমাজের বন্ধু, তা তারা জানে না।

ইল্মী আলোচনায় লেজে-গোবরে হয়ে গিয়ে কোন রাস্তা না পেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপর আক্রমণ করলেন। কারণ, তাদের গায়ে কাদা না মাখালে আপনি প্রচলিত দুআ প্রমাণ করতে পারছেন না। কিন্তু তাই কি হয়? শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না।

আপনার বক্তব্যের মধ্যে অহংকার রয়েছে। তাই মনে পড়ে গেল ব্যাঙ পটাসের গল্প। শুনুন তাহলে, এক নদীর তীরে কোন খালে একটি ব্যাঙ বাস করত। তার ছিল দু'টি বাচ্চা। একদিন বাইরে যাওয়ার সময় বাচ্চা দু'টিকে বলল, 'বাইরে বের হবি না।' ব্যাঙ চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর একটি গরু চড়তে চড়তে ঐ খালের দিকে চলে যায়। গরুটিকে দেখে বাচ্চা দুটির খুব আশ্চর্য হয়। তারপর তাদের মা ফিরে এলে তারা বলে, 'মা, মা! আজকে আমরা অনেক বড় জীব দেখলাম!!' মা তখন পেট ফুলিয়ে বলল, 'হুঁ এত বড়?' তারা বলল, 'এর চেয়ে অনেক বড়।' মা আরো পেট ফুলিয়ে বলল, 'হুঁ, হুঁ হুঁ হুঁ এত বড়!' এই করতে করতে ব্যাঙের পেট পটাস্ করে ফেটে গিয়ে তখনি প্রাণ হারালো!!! আপনিও সাবধান; নইলে বিপদ হবে! ইল্মী প্রতিবাদ করার ক্ষমতা না থাকলে চুপ থাকুন। অপবাদ ও কুৎসা লেখে নিজের মান ছোট করবেন না!

১৮। আপনার বইটিতে অনেক স্থানে মাযহাবী ভাইদের গ্রন্থ ও শায়েখদের কথা ও ফতোয়া উল্লেখ করেছেন। ঐগুলোকে যদি চূড়ান্ত বলে মনে করেন, তাহলে ভুল

করবেন। আহলে হাদীসগণ সহীহ হাদীসের উপর আমল করার চেষ্টা করেন, সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে মাসায়েল ও ফতোয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন, যাঁরা অনেক ক্ষেত্রে রায়ের উপর ফতোয়া দিয়ে থাকেন, তাকলীদ করেন, তাঁদের ফতোয়া বর্জন করেন। আর আপনি একজন আহলে হাদীসের দাবীদার, কেমন করে ঐ পথে পা বাড়ালেন? আপনি কেমন আহলে হাদীস!? মাযহাবীদের মন যোগাচ্ছেন না তো?

১৯। আপনি ৭২নং শিরোনামে লেখেছেন, 'পাঁচ ভাগের চার ভাগ ইমাম মুক্তাদী একত্রে মিলে হাত তুলে দুআ করে।' আর তার তালিকায় যে গ্রামের নামগুলি উল্লেখ করেছেন তা পড়ে যা জানতে পারলাম, তা নিম্নরূপ ঃ-

ক) আপনার জানা মতে আশেপাশে বীরভূমের কিছু গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন। বীরভূম জেলার এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে ঐ প্রচলিত দুআ হয় না, সেগুলোর নাম উল্লেখ করেন নি। মাত্র কয়েকটি গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন।

খ) আপনি নিজ দল ভারী করার জন্য কয়েকটি গ্রাম ছাড়া অধিকাংশ বিদআতী গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে কোন কোন গ্রামে শির্কী কর্ম হয়। আপনি নিজ দল ভারী করার জন্য সে সব গ্রামগুলির নাম উল্লেখ করেছেন, সেগুলোতে মীলাদুন্নাবী, শবে বরাত হয়, কবর পাকা করা হয়, কবরে চাদর চড়ানো হয়। আপনিও তাদের সাথে উক্ত কর্মসমূহ করতে আরম্ভ করুন। কারণ, সেগুলি আপনার দলীল!!! কথায় বলে 'যেমনি কানা বেগুন, তেমনি তার ডোগলা খদ্দের।'

কেন পরিসংখ্যান নেওয়ার সময় মক্কা-মদীনার কথা বললেন না? আপনি যাঁর ফতোয়াকে 'রাজেহ' বলে বল দেখিয়েছেন, সেই মুবারকপুরীর মাদ্রাসা-মসজিদে কি আপনার ঐ দুআ হয়? সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখিয়ে কি হক প্রমাণ করা যায়? আপনি কি জানেন না,

{وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّـنَّ وَإِنْ هُـمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} (١١٦) سورة الأنعام

অর্থাৎ, যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত ক'রে দেবে। তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে এবং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথাবার্তাই বলে থাকে।

২০। ৫৪পৃঃ ৭৫নং শিরোনামে (বিদআতে নে'মা---বিদআতে হাসানা) এর অধীনে ৫৫পৃঃ শেষের দু'লাইনে বলেছেন, 'আমি বিদআতে হাসানা মানি!'

আপনি জানেন, বিদআতের প্রকার-ভেদ কারা করেছে, আর কেনই বা করেছে? এটি তৈরী করেছে বিদআতীরা তাদের বিদআতী কর্মকান্ড বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। বর্তমানে যেমন কিছু লোক ব্যাংকের সূদকে ইন্টারেষ্টের নামে হালাল করেছে, ঠিক সেই রকম।

قال الشيخ عبد الغني النابلسي في "كشف النور عن أصحاب القبور" : ما خلاصته أن البدعة الحسنة الموافقة لمقصود الشرع تسمى سنة فبناء القباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاء ووضع الستور والعمائم والثياب على قبورهم أمر جائز إذا كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامة....

অর্থ, আব্দুল গনী নাব-লেসী 'কাশফুন নূর আন আসহাবিল কুবূর' গ্রন্থে বলেন, যার সার কথা হল, 'শরয়ী উদ্দেশ্যের অনুসারী বিদআতে হাসানা এর নাম রাখা হয় 'সুন্নাহ'। সুতরাং উলামা, আওলিয়া ও নেক লোকগণের কবরসমূহের উপর গম্বুজ তৈরী করা, পর্দা, পাগড়ী এবং কাপড় (দিয়ে ঢাকা) বৈধ, যখন এটি সাধারণের সামনে তাদেরকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্য থাকবে! *(রুহুল বয়ান, সুরাহ তাওবা, ৩য় খন্ড ৩০৪ পৃঃ)*

سؤال رقم ٢٠٥- هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة

الجواب : الحمد لله، كيف يمكن أن تكون هناك بدعة حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النّار". رواه النسائي ١٥٦٠

فإذا قال قائل بعد ذلك إنّ هناك بدعة حسنة فماذا يمكن أن يكون إلا معانداً للرسول ﷺ.

অর্থ, প্রশ্ন নং ২০৫, ইসলামে কি বিদআতে হাসানা আছে?

উত্তরঃ আল-হামদুলিল্লাহ, বিদআতে হাসানা থাকা কেমন করে সম্ভব, অথচ রাসূল ﷺ বলেছেন, "সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা। আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম।" *(নাসাঈ ১৫৬০নং)* এর পরেও যদি কোন বক্তা এ কথা বলে যে, (ইসলামে) বিদআতে হাসানা আছে, তাহলে সে রসূল ﷺ-এর বিরোধী ছাড়া আর কি হতে পারে? *(শায়েখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ফাতাওয়াল ইসলাম ১/ ১৭৪১)*

এবার আপনি চিন্তা করুন, বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করতে বাতিলের সাহায্য নিচ্ছেন কি না?

শায়েখ সফীউর রহমান মুবারকপুরী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মুখ থেকে অমি স্বয়ং শুনেছি,

তিনি বলেছেন, 'বিদআতকে দু'ভাগে ভাগ করা হল তৃতীয় বিদআত।'

আপনার ৭৫নং শিরোনাম পাঠে দু'টি জিনিস বুঝতে পারলাম,

ক) আপনি শরয়ী পরিভাষায় বিদআতের অর্থ বুঝেন নি।

খ) বুঝেও না বুঝার ভান করেছেন। যদি প্রথম অবস্থায় থাকেন, তাহলে বিদআতের সংজ্ঞা শুনুন,

هي طريقة مخترعة في الدّين يُقصد بها التعبّد والتقرب إلى الله تعالى . وهذا يعني أنّه لم يـــرد بها الشّرع ولا دليل عليه من الكتاب أو السنة ولا كانت على عهد النبي صلى الله عليه وســـلم وأصحابه ، وواضح من التعريف أيضاً أنّ المخترعات الدنيوية لا تـــدخل في مفهـــوم البدعـــة المذمومة شرعاً.

অর্থ, সেটি হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত পথ, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলার উপাসনা এবং নৈকট্য লাভের ইচ্ছা করা হয়। এর অর্থ হচ্ছে শরীয়তে যার সম্পর্কে না কিছু বর্ণিত হয়েছে, না কুরআন-সুন্নাহ থেকে তার প্রমাণ আছে, না তার প্রমাণ নবী ﷺ-এর যুগে এবং তাঁর সাহাবার যুগে ছিল। এই সংজ্ঞা থেকে আরো স্পষ্ট হয় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে পার্থিব আবিষ্কার এই জঘন্য বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। *(ফাতাওয়াল ইসলাম ১/৬৩৯৩)*

আর যদি দ্বিতীয় অবস্থায় থাকেন, তাহলে তার কোন ঔষধ নেই, তার বিচার আল্লাহর কোর্টে হবে ইনশাআল্লাহ।

কথায় বলে, 'বুঝেও যে বুঝে না, তাকে বুঝানো দায়।'

ইল্‌ম গোপন করার কি শাস্তি তা জেনে থাকবেন অবশ্যই। আপনি বাতিলের উকালতী করছেন।

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দুআ ইত্যাদি ডাইরেক্ট ইবাদত, এগুলো মূল লক্ষ্য। শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা তৈরী উপলক্ষ্য বা শিক্ষার সহযোগী। তাহলে মাদ্রাসা তৈরী বিদআত বা বিদআতে হাসানা হতে যাবে কেন?.......... আম-আমড়া এক নয়। আপনি চাল-ডাল, কাক-কোকিল, মাছি-মৌমাছিকে যে এক ক'রে দিয়েছেন!

২১। ৫৬ পৃঃ প্রথম দ্বিতীয় লাইনে লেখেছেন, 'বিশ্বের আম জনতার কাছে যা সুন্দর যাতে মানুষ উপকৃত হবে, তাতে আমার বিরোধ নেই।'

শরীয়তের কোন শর্ত ব্যতীত অর্থাৎ, সুন্নত-বিদআত, হালাল-হারাম শর্ত ছাড়া আমভাবে ফতোয়া দিয়ে বিশ্বে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করলেন। ইসলাম বিরোধীদের নিকট হতে পুরস্কারের হকদার হয়েছেন আপনি। বিশ্বের মানুষের কাছে যা 'সুন্দর যাতে মানুষ

উপকৃত হবে' সাধারণভাবে শর্ত ছাড়া বলেছেন, তাতে আপনার দ্বিমত নেই। তার মানে মানুষ যা ভাল মনে করবে, সেটিই আপনার কাছে শরীয়ত, বাঃ!!

আমার প্রশ্ন অধিকাংশ মানুষ মুখের দাড়ি চেঁছে দেওয়া সৌন্দর্য মনে করে, দাড়ি চাঁছতে আপনার দ্বিমত নেই। বর্তমানে অনেক যুবক গলায় সোনার চেন পড়া, হাতে লম্বা নখ রাখা, গাঁটের নীচে প্যান্ট্ পরিধান করা সভ্য বলে মনে করে, এগুলোতে আপনার বিরোধ নেই?! বিশ্বের অনেক মানুষ সূদ খেতে চায় তাতে তাদের আর্থিক উপকার আছে, এতে আপনার কোন বিরোধ নেই। আপনি চরম দেলদারের পরিচয় দিয়েছেন দেখছি। দুআ এবং ইবাদত করা---না করার বিধান কি বিশ্বের মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল? যেটি তাদের কাছে সুন্দর, তাদের কাছে লাভজনক সেটিই শরীয়ত? তাহলে কুরআন-হাদীস ঠুঁটো জগন্নাথ নাকি? আপনি যা আরম্ভ করেছেন, তাতে দ্বীন ধ্বংস হয়ে যাবে। কথায় বলে, 'নীম ডাক্তার খাতরায়ে জান, আর নীম মোল্লা খাতরায়ে ঈমান!!'

২২। ৬৪পৃঃ ৫৭নং শিরোনাম দিয়েছেন 'সুযোগ সন্ধানী' তারপর লেখেছেন, 'এরা সুযোগ সন্ধানী।'

এ কথায় আমরা খুব খুশী। জাযাকাল্লাহু খাইরা, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা সব সময় কুরআন ও সহীহ হাদীস মেনে চলার সুযোগ সন্ধানে থাকি।

এই জন্য এককভাবে কারো অন্ধানুকরণ করি না। ভেবে দেখুন, আপনিও কিন্তু একই শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী। আপনিও একই বইয়ে জামাআতী মুনাজাতের ব্যাপারে মুবারকপুরীকে দলীল বানিয়েছেন। কিন্তু মাগরেবের ফরয নামাযের পূর্বে দু' রাকআত নফলের ব্যাপারে তাঁর কথা নেননি।

আর জামাআতী দুআ বন্ধ করাতে কার কি সুযোগ ও লাভ আছে বলুন? বরং জামাআতী মুনাজাত তথা দুআ-মজলিস প্রমাণ ক'রেই জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে মাঝে-ফাঁকে মুরগী-ভাত পাওয়া যাবে। সুতরাং আসল সুযোগ-সন্ধানী কে?

৪৭পৃষ্ঠা ৫৯নং শিরোনামে লেখেছেন, 'তারা ইমামের পিছনে ফাতেহা পড়া ছেড়ে দেন, আমরাও ফরয নামায বাদে যৌথ দুআ ছেড়ে দেবো!'

এ তো একটি মুকাল্লেদের কথা। কিন্তু আমরা তো কারো অন্ধ তকলীদ করি না। আমরা সহীহ সুন্নাহ দেখে অনুসরণ করি মাত্র। তাতে ফতোয়া যাঁরই হোক।

২৩। ৬১পৃঃ 'হাদীস কাকে বলে' এই শিরোনাম লেখেছেন, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'। মা শাআল্লাহ 'হাদীস কাকে বলে' এই শিরোনামে ঐ হিদায়াতনামা নিজ ছাত্রকে

দিয়েছেন, যাতে উসতাজী সাপ-ব্যাঙ যা বলবেন, তাই চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে নেয়। কোন রকম তাহকীক না করতে যায় এবং প্রশ্ন না করে। শিক্ষককে প্রশ্ন করা মানে বেআদবী করা হয়। আমি বলি, এই ফিতনার যুগে সহীহ-যয়ীফ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ বেছে না চললে কচুর গোঁড়ো মিলবে। আল্লাহ এত সাধু সাজতে বলেন নি, তিনি আমাদেরকে তাহকীক করতে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (٦) سورة الحجرات

অর্থ, হে মুমেনগণ! যদি তোমাদের কাছে কোন ফাসেক্ব ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা সেটি তাহকীক করে নাও, যাতে তোমরা অজানতে কোন কাউমকে কষ্ট না দিয়ে ফেল। অতঃপর তাতে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মে লজ্জিত হও। (হুজরাত ৬ আয়াত)

আপনাকে আরো ধন্যবাদ জানাই যে, আপনি বাংলায় কয়েক পৃষ্ঠায় 'হাদীস কাকে বলে' তা ইঙ্গিতে ঐ ব্যক্তিদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যারা কুল্লিয়াতুল হাদীস, তাফসীর-হাদীসে অর্নাস কোর্স ও তার উপরে ডিগ্রী লাভ করেছে। আসলে আপনি 'মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প' করেছেন এবং সূর্যকে লণ্ঠন দেখিয়েছেন। গোপাল ভাঁড়ের গল্প পড়েছেন? গোপাল তার ছেলেকে বলেছিল, 'বাবা! লালটেনটা জ্বেলে দেখ্ তো সূর্য উঠেছে কি না?' আপনার ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি হয়েছে, ভেবে দেখেছেন??

২৪। ৫৯পৃঃ 'হাদীস কাকে বলে' এর ভূমিকার নীচে লিখিত কথাগুলো পাঠ করে বুঝতে পারলাম, আপনি পৃথিবীর এক বিরল লেখক। শিরোনামের সাথে তথ্যে খেজুর গাছের কান্ডের মত মিল পেলাম!! ভূমিকায় হাদীসের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লেখা, উসূলে হাদীস ও তার সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তারপর ধাপে ধাপে মূল বিষয় দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভূমিকার এক অংশে দেখতে পেলাম...... 'যে নিজের বাপকে বাপ বলে নাই, পরের বাপকে বাপ বলে, যে নিজ জন্মভূমি ভুলে গিয়ে মাদানী নামে পরিচিতি দেয়..' তারপর শায়েখ আব্দুল হামীদ মাদানীর নাম ও শায়খ আব্দুল্লাহ সালাফীর নাম উল্লেখ করে এবং অনেকের নাম উল্লেখ না করে অপবাদ ও কুৎসা রটিয়ে জুত করে গায়ের ঝাল মিটিয়েছেন!!!

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা ডিগ্রী লাভ করে তাদেরকে 'মাদানী' বলে, এ উপাধি অনেক পূর্ব হতে চালু আছে, ভারতে 'মাদানী' উপাধি সুপরিচিত। এর পূর্বে কতজন

মাদানী হয়ে দেশে এসেছে, মাদানী উপাধি শুনে কারোর জ্বালা ধরে---তা জানতাম না, এ জ্বালাতে আপনিই প্রথম। তাও আবার বাড়ির জামায়ের প্রতি! বরং মাদানী শুনলে মুসলিমরা শ্রদ্ধা করে, অবাক হয় এটাই জানি। কারণ, মুসলিমদের স্মরণ হয় রাসূল ﷺ-এর কাজ-কর্ম, তাঁর মসজিদ ইত্যাদি। সেখানে জড়িয়ে আছে মুসলিমদের অমূল্য অজস্র স্মৃতি। তাই অনেকে গজলে বলে থাকে, 'মনে বড় আশা ছিল যাব মদীনায়, আশা আছে মোর সম্বল নাই রে করি কি উপায়?' আপনি কেমন মুসলমান, মাদানী নাম শুনে জ্বলেন!? যারা চার বা তার বেশী বছর ধরে মাদীনাতুর রাসূলে পড়াশুনা করে 'মাদানী' উপাধি পেল তাদেরকে যদি সহ্য করতে না পারেন, তাহলে দেখব আপনি পাঁচ দিনে হজ্জ করে 'হাজী' বা 'আল-হাজ্জ' উপাধি গ্রহণ করেন কি না? কথায় বলে আঙ্গুর ফল টক!!! 'হাদীস কাকে বলে' এর ভূমিকায় আপনার লেখনি ভূত নয় অদ্ভুত হয়েছে। বাতিলপন্থীদের এটাই বৈশিষ্ট্য। তারা যখন দলীল কায়েম করতে না পারে, তখন আবোল-তাবোল বকে গায়ের ঝাল মিটায়। যেমন, একজন সূফী (মৃত ১২৪১হিঃ) জালালাইনের হাশিয়া-লেখক আহলে হাদীসদের সম্পর্কে বলেছিল,

إن الوهابية نظائر الخوارج.

অর্থাৎ, ওয়াহাবীরা খাওরেজদের মত। *(তানযীহুস সুন্নাহ অল-কুরআন, আ'ন আঁই য়্যাকূনা মিন উসুলিয্ যালাল অল কুফরান)* সে খাঁটি মুসলিমদের কোন ত্রুটি না পেয়ে বলল, 'ওয়াহাবীরা খাওয়ারেজদের মত।'

মুস্তাশরিক্ব (পশ্চিমী আরবী শিক্ষিত ব্যক্তি)রা ঐ পথ অনুসরণ করেছিল, জোলসেহার নামক এক কুখ্যাত লেখক ইমাম যুহরীর চরিত্রে দাগ লাগিয়ে তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসসমূহকে লোক সমাজের কাছে মূল্যহীন করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাতে সক্ষম হয় নি। *(আসসুন্নাতু অমাকানাতুহা ২১৭ পৃঃ)*

আর আরবী কবি বলেছেন, إذا يئس الإنسان طال لسانه...

অর্থাৎ, মানুষ নিরাশ হয়ে গেলে তার জিভ লম্বা হয়ে যায়।

২৫। আপনি বইটির ৭১পৃষ্ঠায় হিট দিয়ে টিস্ মেরে ব্যঙ্গ ক'রে লেখেছেন, 'এদের আবার কেউ বলে, উর্দু ভালো লাগে, বাংলা বলতে উর্দু বেরিয়ে আসে, হায়রে এমন বাঙালী.....!' অথচ আপনি ৩১পৃষ্ঠায় লেখেছেন, 'দিল নেহি চাহ্তা কিসিকা গিবাত কারুঁ, বা-তসে বা-ত নিকালতি হ্যায় তো কিয়া কারুঁ?'

যে ভূত নিয়ে মাথা ব্যথার কথা বলছেন, সে ভূত আপনার ঘাড়ে চেপে আছে যে!!!

কথায় বলে, 'নিজের পানে চায় না শালী, পরকে বলে টোবো গালী।' তাও আবার ভুল। এই এক লাইন উর্দু লেখতে গিয়ে যদি ভুল হয়, তাহলে আপনাকে কিসের শাহাদা দিব!? উর্দুতে 'কিসী কী গীবাত' হয়, 'কিসি কা গিবাত' হয় না। খোঁড়া পায়ে জুতো পড়তে গেলে ঐ অবস্থাই হয়। যারা ইংরেজী পরিবেশে দীর্ঘকাল পড়াশোনা করেছে, অনিচ্ছায় তাদের মুখ থেকে কথায় কথায় ইংরেজী বেরিয়ে আসা খুব আশ্চর্য ব্যাপার নয়। যারা আরবী পরিবেশে দীর্ঘকাল পড়াশোনা করেছে অনিচ্ছায় তাদের মুখ থেকে কথায় কথায় আরবী বেরিয়ে আসা খুব আশ্চর্য ব্যাপার নয়। তেমনি যারা উর্দু পরিবেশে দীর্ঘকাল পড়া-শুনা করেছে অনিচ্ছায় তাদের মুখ থেকে কথায় কথায় উর্দু বেরিয়ে আসা খুব আশ্চর্য ব্যাপার নয়, বরং যাদের জন্ম বাঙালীর ঘরে, পড়াশোনা বাংলা পরিবেশে, উর্দু পড়তে হলে বানান করতে হয়, তাদের মুখ থেকে উর্দু বের হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়; বরং তা তাকাল্লুফই বলতে হবে।

২৬। ৪৭নং শিরোনামের অধীনে লেখেছেন, 'এক বিষয়ী হাদীস ক্রমাগত বর্ণিত হতে থাকলে তা যায়ীফ হলে তা আর যায়ীফ থাকে না। তা মুতাওয়াতার (?) বা সহীহ হয়ে যায়।'

এই নতুন তথ্য দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। পৃথিবীর কোন পন্ডিত ঐ কথা বলেন নি, এ বলনে আপনিই প্রথম। এখানেও হাদীসের পরিভাষা লেখতে ভুল করেছেন! 'মুতাওয়াতার' নয়, শব্দটি 'মুতাওয়াতির'। এক বিষয়ী হাদীস ক্রমাগত বর্ণিত হতে থাকলে তা মুতাওয়াতির হয় না। আপনি মনে হয় মুতাওয়াতির হাদীসের সংজ্ঞা জানেন না! শুনুন মুতাওয়াতির হাদীসের সংজ্ঞা---

ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس.

অর্থাৎ, যে হাদীসকে এমন একদল (মুহাদ্দিস) বর্ণনা করেছেন, যাঁদের আপোসে মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব এবং তাঁরা তা বাস্তব কোন জিনিসের সাথে সনদ বর্ণনা করেছেন।

আর 'মুতাওয়াতির' তো সহীহ হাদীসের সর্বোচ্চ পর্যায়। তা যয়ীফ যুক্ত যয়ীফ মিলিয়ে হতে যাবে কেন? অবশ্য 'হাসান' বলতে পারতেন। তাও আবার বেশী যয়ীফ হলে 'হাসান' ও হবে না। ঐ শুনুন ইবনে হাযম (রঃ) কি বলেছেন,

ولو بلغت طرق الضعيف ألفاً لا يقوى ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفاً.

অর্থাৎ, যয়ীফের সূত্রসমূহ যদি এক হাজারও হয়, তাহলে তা ক্বাবী বা সবল হবে না।

দুর্বলের সাথে দুর্বল মিলে সে হাদীসের দুর্বলতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

আল্লামা আহমাদ শাকের (রঃ) বলেন,

وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه ، فان الضعفاء قد يسرق بعضهم من بعض و يشتهر عندهم فقط ، و لا نجده في روايات الثقات الأثبات مما لا يزيد الضعيف الا ضعفاً على ضعف.

অর্থাৎ, এটাই হল হক, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ যয়ীফ রাবীরা এক অপর থেকে চুরি করতে পারে এবং সে হাদীস কেবল তাদেরই নিকট প্রসিদ্ধ হতে পারে। আর তা নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত সিকাত রাবীদের রেওয়ায়েতে আমরা না পেলে এটাই (প্রমাণ) হবে যে, দুর্বল হাদীসের দুর্বলতা আরো বেশী বৃদ্ধি পাবে। *(আসারু ইলালিল হাদীস ফী ইখতিলাফিল ফুক্বাহা ৩/২৬)*

এবার আপনি বুঝতে পারছেন, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)কে নিয়ে কেন হৈ চৈ?

তাছাড়া 'দুআ'র হাদীসগুলি মুতাওয়াতার হলেও, 'ফরয নামাযের পর জামাআতী দুআ'র হাদীসগুলি তো তা হচ্ছে না। তাই নয় কি? তাহলে কেন এ তালগোল?

২৭। ছাত্র-শিক্ষক প্রশ্নোত্তর পূর্বে এক জায়গায় লেখেছেন, 'হ্যাঁ কুরআন শরীফের শত জায়গায় দুআ করার আয়াত আছে। তবে দুআ না করার কোন আয়াত বা হাদীস নাই। দুআ না করার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বাক্য অথবা উভয় গ্রন্থে কোথাও নিষেধ-জ্ঞাপক অব্যয় নাই।'

আপনার কাছে জিজ্ঞাসা, কুরআনে শত জায়গায় দুআর কথা বলা হয়েছে, কম-বেশী না করে নির্দিষ্ট করে শত জায়গা প্রমাণ করতে পারবেন কি? এটি দ্বীনী আলোচনা বাক-সার্ভিস দিয়ে জয় করা যাবে না। শুদ্ধ তথ্য দিয়ে বলুন, কুরআনে অনেক জায়গায় দুআর কথা উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু তা কখনো ইবাদতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কখনো দুআর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আম বা সাধারণভাবে। 'দুআ করতে নিষেধ নেই' বলে যেখানে যেভাবে ইচ্ছা দুআর ফতওয়া জারি করলে চলবে না, নচেৎ সব শেষ হয়ে যাবে। আপনার ফতওয়ার উপর আমল করে যদি বলি, কুরআন-হাদীসে কোন জায়গায় 'তাজিয়া' করতে নিষেধ করা হয়নি, তাহলে আপনাকে সবাইকে নিয়ে জামাআতবদ্ধভাবে 'তাজিয়া' করতে হবে!! জনাবে আলী, ফতওয়া অত সহজ নয়। অনেক নিয়ম-নীতি, মাক্বাসিদুশ্ শারীয়াহ পড়তে হয়, জানতে হয়। ইবাদতের ক্ষেত্রে কি নিয়ম নীতি আছে জানেন/শুনুন। দলীল ছাড়া কোন ইবাদত বৈধ নয়, এটিই ইবাদতের মৌলিক নীতি। ইবাদত মুলতঃ নিষিদ্ধ, কেবল শুদ্ধ দলীল দ্বারা প্রমাণিত

হওয়া অবস্থায় তা বৈধ। কোন ইবাদত নিষিদ্ধ করার জন্য দলীল প্রমাণ জরুরী নয়, দলীল না থাকাটাই সেই ইবাদত নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল। যেমন, 'তাজিয়া' নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য দলীলের প্রয়োজন নেই। 'তাজিয়া' করার দলীল কুরআন-হাদীসের না থাকাটাই তা নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল। বুঝলেন মাওলানা?

২৮। ৬২ নং শিরোনামের অধীনে লেখেছেন, "অন্যদিকে, আশুরার রোযা অনেকে রাখতো না। এখন কিছুদিন থেকে ঐ রোযা রাখতে শুরু করেছে। আগে অতো গুরুত্ব দিতে দেখা যায় নাই। এখন 'অ্যাতো' গুরুত্ব দিচ্ছে, যেন অয়াজেব-অত্যাবশ্যক। তাকিদ দিতেও দেখা যায়।"

আমি বলি রাসূলের একটি সুন্নতের উপর আমল আরম্ভ হওয়াতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না কি? অনেকে এই রোযা রাখতো না বলে আপনি খুব আনন্দিত!? আপনার 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলা উচিত ছিল? আপনার কথা 'আগে অতো গুরুত্ব দিতে দেখা যায় নাই' ঠিক আছে, আগে এ সব গুরুত্ব ছিল না, আগে অনেক বুড়ো বসে বসে হুঁকো টানতো, আপনি কি চান লোকের এই রোযা বাদ দিয়ে হুকো টানুক?

'রামযানের রোযা ফরয হওয়ার কারণে, নাবী (সঃ) তা ছেড়ে দেন।'---তার মানে কি তিনি ঐ রোযা রাখাই ছেড়ে দেন? তার মানে কি ঐ রোযা মানসূখ? আল্লাহর নবী ﷺ কি ইন্তিকালের আগের বছর বলেননি, "তাহলে আমরা আগামী বছরে ৯ তারীখেও রোযা রাখব ইনশাআল্লাহ।" কিন্তু আগামী বছর আসার আগেই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল হয়ে গেল। *(মুসলিম ১১৩৪, আবূ দাঊদ ২৪৪৫নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আজকে আশূরার দিন; এর রোযা আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয করেননি। তবে আমি রোযা রেখেছি। সুতরাং যার ইচ্ছা সে রোযা রাখবে, যার ইচ্ছা সে রাখবে না।" *(বুখারী ২০০৩, মুসলিম ১১২৯নং)*

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ রমযানের রোযার পর আশূরার দিন ছাড়া কোন দিনকে অন্য দিন অপেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ মনে করতেন না।' *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ১০০৬ নং)*

প্রিয় পাঠক! এ সকল হাদীস থেকে কি প্রমাণ হয় যে, '...... নাবী (সঃ) তা ছেড়ে দেন?' ঐ দেখুন ইবনে হাজার কি বলেন,

وَيُؤْخَذ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَحَادِيث أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا لِثُبُوتِ الْأَمْر بِصَوْمِه ثُمَّ تَأَكَّدَ الْأَمْر بِذَلِكَ ثُـــمَّ زِيَادَة التَّأْكِيد بِالنِّدَاءِ الْعَامّ ثُمَّ زِيَادَته بِأَمْرِ مَنْ أَكَلَ بِالْإِمْسَاكِ ثُمَّ زِيَادَته بِـــأَمْرِ الْأُمَّهَـــاتِ أَنْ لَـــا

يُرْضِعْنَ فِيهِ الْأَطْفَال وَبِقَوْلِ ابْن مَسْعُود الثَّابِت فِي مُسْلِم " لَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ عَاشُورَاءُ " مَعَ الْعِلْم بِأَنَّهُ مَا تُرِكَ اسْتِحْبَابُهُ بَلْ هُوَ بَاقٍ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَتْرُوك وُجُوبُهُ . وَأَمَّا قَوْل بَعْضهمْ الْمَتْرُوك تَأَكُّدُ اسْتِحْبَابه وَالْبَاقِي مُطْلَقُ اسْتِحْبَابه فَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ ، بَلْ تَأَكُّدُ اسْتِحْبَابه بَاقٍ وَلَا سِيَّمَا اسْتِمْرَار الِاهْتِمَام بِهِ حَتَّى فِي عَام وَفَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ يَقُول " لَئِنْ عِشْت لَأَصُومَن التَّاسِع وَالْعَاشِر " وَلِتَرْغِيبِهِ فِي صَوْمه وَأَنَّهُ يُكَفِّرُ سَنَة ، وَأَيُّ تَأْكِيدٍ أَبْلَغُ مِنْ هَذَا ؟ فتح الباري لابن حجر - (٦ / ٢٨٣)

পক্ষান্তরে এই শ্রেণীর তাকীদ কি উনার ঐ 'যৌথ দুআ'র ব্যাপারে আছে? এর সাথে যৌথ দুআর কি সাথ? সূরা মুমিনের প্রসিদ্ধ দুআর আয়াতের সাথে ফরয নামাযের পরে যৌথ দুআরই বা কি সাথ?

আসলে নাড়ীটেপা ডাক্তারে অপারেশন করতে লাগলে, রোগের জায়গায় রগই কাটা যায়!

২৯। ৬৩নং শিরোনাম দিয়েছেনঃ 'রামযা-নের রোযা ফরয হওয়ার পর আ-শুরার রোযায় নাবী সঃ ততো উৎসাহিত করতেন না।' পরে লিখেছেন, 'কিন্তু ভাষণে অয়া-জেবের আসনে বসিয়ে দেয়।' এ কথাটি মিথ্যা, কেউ ওয়াজিবের আসনে বসাইনি, বরং ফযীলত, গুরুত্ব, সুন্নত এবং উত্তম বলে থাকেন। জনাব কোন সুন্নতকে বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে তাকীদ দিলে, উৎসাহ করলে তা ওয়াজিব হয়ে যায় না। আসলে আপনি সুন্নতী তরীকায় আমল বিরোধী বলে আপনাকে তাই মনে হয়েছে!! এই সুন্নত পালনে রাসূল ﷺ ফযীলত বর্ণনার মাধ্যমে সাহাবাগণকে উৎসাহিত করেছেন এবং রোযা রাখার দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

যে বর্ণনা আপনি উল্লেখ করেছেন তার অর্থ, ফারযিয়াত রহিত করা, ঐ কর্মে নিরুৎসাহিত করা উদ্দেশ্য নয়।

জনাব লেখক সাহেব! আপনাকে আমি জানতামই না, সাক্ষাৎ হয়েছে কি না তাও জানি না, আপনার বই পড়া কালীন মনে হচ্ছিল, এই জন্য সমাজে মৌলভী সাহেবদের মর্যাদা নেই। এই জন্য পাবলিকে বলে, 'মৈলিবীরাই মাটি করল।' আপনার প্রতিবাদ লেখার যে পদ্ধতি তাতে একজন সাধারণ মানুষ সেটিকে ঘৃণা করবে। আপনাকে জানলাম শায়খ আব্দুর রউফ শামীম সাহেব (রাহেমাহুল্লাহ)-এর পরিচিতিতে। কারণ, তিনি আমাদের সমাজে সুপরিচিত, তিনি ছিলেন যোগ্য লেখক, সুবক্তা, আদর্শ শিক্ষক ও

সমাজ-সংস্কারক। মাদ্রাসায় শিক্ষক থাকাকালীন অনেক যোগ্য ছাত্র তৈরী করেছেন, বক্তৃতার মাধ্যমে সমাজের বহু সংস্কার সাধন করেছেন। আমি যখন জানতে পারলাম আপনি তাঁর আপন ভাই, তখন আমি অবাক হয়েছিলাম এই বলে যে, দু'ভায়ের মধ্যে এতো পার্থক্য কেন? শামীম সাহেব ছিলেন নম্র, ভদ্র এবং সমীহভাজন। এই জন্য আল্লাহ তাঁকে সম্মান দিয়েছিলেন, সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আর তাঁরই পরিচয়ে আপনার পরিচিতি পেলাম। আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সময় বলা হল, উনি শামীম সাহেবের ভাই। তখন আর কিছু জানার প্রয়োজন হয় নি। আমার বলার উদ্দেশ্য হল, আপনিও তাঁর মত হওয়ার চেষ্টা করুন, কথা ও ব্যবহারে মানুষের মন জয় করুন, সঠিকভাবে দ্বীনের খিদমত করুন। আপনিও তাঁর মত সম্মান ও প্রসিদ্ধি পাবেন। ইনশাআল্লাহ!

আপনার বইটির প্রতিবাদ খুব হালকা করে লেখা হল, উকুন বাছা, কম্বলের লোম বাছার মত দেওয়া হয়নি। আর সে রকম সময়ও নেই।

সতর্কতা

বিতর্কিত দুআ নামাযের ফরয, রুক্ন কিছুই নয়, তর্ক হচ্ছে সুন্নত না বিদআত নিয়ে? আপনি যে পথ অবলম্বন করছেন, সেটি চরম বিপজ্জনক। কারণ, বিদআতকে যদি সুন্নত বলে আমল করেন, তাহলে পাপ হবে ঠিক। কিন্তু তার চাইতে আরো বিপজ্জনক---যদি বিদআতকে সুন্নত বলে ফতোয়া দেন!! যদি কেউ সুন্নতকে বর্জন করে থাকে, তাহলে সওয়াব পাবে না ঠিক কথা; কিন্তু বিদআতকে সুন্নত ফতোয়া দেওয়ার মত বিপজ্জনক নয়। চাঁদনী রাতের অস্পষ্ট আলোর উপর ভিত্তি করে পা বাড়ালে ঠকতে হবে অবশ্যই, পথে পানি না শুকনো মাটি---তা বুঝতে পারবেন না। সূর্যের আলোয় চলে ভালভাবে নিশ্চিত হয়ে পা বাড়ান। প্রচলিত দুআটাও সেই রকম। তার প্রমাণে সুনিশ্চিত দলীল নেই। আর নিশ্চিত দিকটা রাসূল ﷺ গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

[دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة] رواه الترمذي

অর্থাৎ, সন্দেহযুক্ত বস্তুকে বর্জন করে নিঃসন্দেহ বস্তুকে গ্রহণ কর, কেননা, সত্য হচ্ছে প্রশান্তি আর মিথ্যা হচ্ছে সন্দেহজনক। *(তিরমিযী, হাদীস সহীহ)*

তাই আপনার এ বিষয়ে এত ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।

পরামর্শ

আপনি যা লেখেছেন আপনার মন তা বুঝতে পারছে, প্রবাদে আছে, 'মনে জানে পাপ, আর মায়ে জানে বাপ।' জেদ বহাল করা বাদ দেন। জেদ করে লাভ হয় না, আমাদের সমাজ বহু কুসংস্কারের বন্যায় নিমজ্জিত, শির্ক-বিদআতে ভরপুর। সেগুলো উচ্ছেদ করার চেষ্টা করুন আখেরাতে লাভবান হবেন---ইন শাআল্লাহ। আমাদের সমাজে পাঁচ মিশেলি আক্বীদা কর্ম প্রচলিত আছে, সব বিষয় বাদ দিলাম, আপনি কেবল বিবাহর ক্ষেত্রে দেখুন কত রকমের কুপ্রথা চলছে; কুরআন-হাদীসে যার কোন প্রমাণ নেই। সেগুলো নিয়ে চিন্তা করেছেন? পর্দা নিয়ে চিন্তা করেছেন? হালাল-হারাম খাওয়া নিয়ে একবারও গবেষণা করছেন? সিংহভাগ মুসলিমের ঘরে সূদ প্রবেশ করেছে সে নিয়ে ভাবনা ভেবেছেন? স্বেচ্ছায় নামায বর্জন করলে মুসলিম থাকে না, সে ফতোয়া মানেন কি? জীবন বাঁচানো ফরয না চামড়া চিকন করা ফরয? মুসলিমরা নামায পড়ে না সে কথায় না গিয়ে, প্রচলিত দুআ নিয়ে খামাখা ঘুম নষ্ট করছেন কেন? আশা করি নিজেকে সংশোধন করে নিবেন।

শায়খ আব্দুল হামীদের প্রতি যে অন্যায় উক্তি প্রয়োগ করেছেন তার জন্য আপনার ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব। নচেৎ, নামায পড়ে জামাআতী দুআ করেও আখেরাতে নিস্তার পাবেন না। কথায় বলে, 'লাভের গুড় পিঁপড়াতে খাবে!!'

শুনুন নবী ﷺ-এর বাণী, তিনি বলেছেন, "তোমরা কি জান নিঃস্ব কে?" তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন, 'আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই, যার টাকা-পয়সা এবং সম্পদ নেই।' রাসূল ﷺ বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত নিয়ে হাযির হবে, অপর দিকে এ অবস্থায় হাযির হবে যে, সে একে গালি দিয়েছে, ওকে অপবাদ দিয়েছে, অপরের সম্পদ খেয়েছে, অপরের রক্ত প্রবাহিত করেছে, অমুককে মেরেছে। অতঃপর একে তার নেকী (কেটে) দেওয়া হবে, ওকে তার নেকী (কেটে দেওয়া হবে, (এই করতে করতে) বিচার শেষ হওয়ার পূর্বেই যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের পাপ তাকে দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে!!! *(সহীহ মুসলিম)*

আখেরাতের শাস্তি কঠিন। তাই দুনিয়াতেই তা মিটিয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যেমন, সাহাবাগণ করেছেন।

প্রকাশক মাও ফাযলুল্লাহ সাহেবকে দুটি কথা ঃ আপনি লেখেছেন, সম্পাদক নুরপুর আঞ্জুমান ইসলাহুল মুসলেমীন। উক্ত সংস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, সংস্থার হাল সংস্কৃত ভাষার মত। সংস্কৃত ভাষা গ্রন্থে আছে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন দেশ বা স্থান নেই, যেখানে মানুষ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে। অনুরূপ আপনার আঞ্জুমানের অবস্থা। তার ইসলাহের কোন খেদমত চোখে পড়ে নি! নাম ইসলাহুল মুসলেমীন। যার অর্থ মুসলিমদের সংস্কার করা। বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, যখন থেকে ঐ সংস্থার দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কি কি সংস্কারের কাজ করেছেন? আমার জানা মতে মাত্র একটি, সেটি হচ্ছে (দুআয়ে রাসূল) নামে একটি পুস্তক প্রকাশ। সেটিরও অনেক জায়গায় সংস্কারের প্রয়োজন আছে। বাস এই খেদমত!? তারপর দ্বিতীয় খেদমত করলেন 'দুআ কেন্দ্রবিন্দুয় সবার লক্ষ্য' (শিরোনাম ভুল) [১] বইটি ছাপিয়ে!! আর কোন বই ছাপাতে পারলেন না? খরচটি কাজে লাগতো। ভালর সহযোগিতা করার জন্য আমরা সকলে আদিষ্ট। আল্লাহ বলেন,

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}

অর্থ, তোমরা সহযোগিতা কর তাক্বওয়াহ এবং নেকীর কাজে, পাপ এবং শত্রুতার কাজে সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা। *(সূরা মায়েদাহ ২ নং আয়াত)*

আমার আশা, ধর্মের প্রচলিত দিক বর্জন করে সঠিকভাবে দ্বীনের খেদমত করবেন, আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন।

আল্লাহুম্মা ইহদে ইবাদাকা ফাইন্নাহুম লা ইয়া'লামূন!! অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দাদের হিদায়াত করুন। কারণ, তারা জানে না। আমার আশা, সত্যকে জেনে আপনাদের নয়নে আনন্দাশ্রু নির্গত হবে এবং আপনারা ঐ ভাগ্যবান ব্যক্তিদের মত হয়ে ধন্য হবেন, যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

{وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ

([1]) এর অনাবশ্যক আরবী নামটিও ভুল। 'নাযরাতুল কুল্লি ইলা নুকতাতিত দায়িরাতিদ দুআ' **نظرة الكل إلى نقطة الدائرة الدعاء** যেহেতু দুআ মুযাফ ইলাইহির পূর্বের মুযাফে আলিফ-লাম দেওয়া হয়েছে। যা সিফাত ছাড়া আসে না। লেখক আবার আরবীতে বই লিখছেন জানলাম। সময়ে তাঁর আরবী পাণ্ডিত্য দেখা যাবে।

يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} (٨٣)

অর্থ, রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন তারা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রু বিগলিত দেখবে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত কর।' *(মায়েদাহ ৮৩নং আয়াত)*

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

মসলা নিয়ে ঘর ভাঙ্গা কেন?

মুহাম্মাদ ইসমাঈল মাদানী
রুমাহ ইসলামিক সেন্টার

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

প্রথমেই বইটির প্রসঙ্গে কিছু কথা! বইটির নাম **(দুআ কেন্দ্র বিন্দুয় সবার লক্ষ্য)**

বইটির নাম মা-শাআল্লাহ খুবই চমৎকার ও সুন্দর, যার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে নেই বললেও ভুল হবে না। কিন্তু বইটি পড়ে আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে যা উপলব্ধি করলাম, তাতে মনে হলো এটা কোন বিদআতী লেখকের পক্ষেই এই ধরণের লেখা সম্ভব। অন্য কোন আহলে হাদীস আলেমের পক্ষে এ ধরণের বিদআতী কর্মকাণ্ড লেখা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু পরে জানতে পারলাম লেখক হচ্ছেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় উসতায ফযীলাতুশ শায়খ আব্দুর রউফ শামীম সাহেব (রহঃ)-এর ছোট ভাই 'মাওলানা আব্দুল হাকীম সাহেব'। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, তিনি একজন আহলে হাদীস আলেম হয়ে কি করে এ ধরণের কথা লিখতে পারলেন? আমার মনে লেখকের ব্যাপারে যে পাহাড়ের মত অগাধ বিশ্বাস ছিল, তা এই বই পড়ে সমস্ত বিশ্বাস চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেল! হায় আফসোস! যাঁদেরকে মনের মণি-কোঠায় প্রকৃত আহলে হাদীস বলে স্থান দিয়েছিলাম, তাঁদের বিশ্বাস যদি এমন হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কেমন হবে---তা এখান থেকেই অনুমান করা যায়। আর এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আহলে হাদীস নামধারী কিছু ছদ্মবেশী আলেমও আছেন; যাঁরা এই ধরণের বিদআতী বাজার রমরমা করতে ব্যস্ত।

আরও একটি বিষয় মাননীয় লেখকের বই পড়ে যা বুঝতে পারলাম তা হচ্ছে, তিনি এই বিদআতকে সমাজের মানুষের নিকট প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বেশ কিছু উলামায়ে

দ্বীনের ব্যাপারে এমন কটু কথা লিখেছেন, যা কল্পনাতীত। যাঁদের নিকট থেকে আমরা সঠিক ইসলামের দিশা পেয়েছি, যাঁদের একনিষ্ঠ ইসলামের খিদমতে সহীহ হাদীসগুলি আজ সকলের হাতের মুঠোয়, চোখের সামনে উদ্ভাসিত, যাঁদের নিকট সমস্ত পৃথিবীর মানুষ ঋণী। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন; আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)। তাঁর ব্যাপারে এমন কথা লিখেছেন, যদি তা সমুদ্রের পানিতে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে সমস্ত পানির রং-স্বাদ পরিবর্তন হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাবে।

অনুরূপ শায়খ আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেবের ব্যাপারেও এমন কিছু অপবাদমূলক ও কুরুচিকর কথা লিখা হয়েছে, তা কোন জ্ঞানী এবং আহলে হাদীস আলেমের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। এই ধরণের লেখা বিদআতী, হিংসুটে ও ছদ্মবেশী আলেমরাই লিখতে পারেন। কিন্তু মাননীয় লেখক তো আহলে হাদীস দাবীদার, তাই মাননীয় লেখককে অবগত এবং অন্যায় ও অসঙ্গত কথা লিখা থেকে সতর্ক করার লক্ষ্যে, তাঁরই লেখার মাধ্যমে কিছু কটুক্তি যাঁদের ব্যাপারে করা হয়েছে তার আংশিক শিরোনামাকারে পেশ করে, শরীয়তের দৃষ্টিতে কত বড় জঘন্য ও ঘৃণ্য তা তাঁর অপবাদে ভুল শিকারের সমাজকে অবগত ও সতর্ক করার লক্ষ্যেই কলম ধরেছি, প্রতিবাদ ও সংঘর্ষ করার জন্য নয়।

আল্লাহ কুরআনে করীমে বলেছেন ;

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤) سورة الشعراء

অর্থ; তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও। *(সূরা শুআ'রা ২১৪ আয়াত)*

কুরআনের এই আয়াতের ভাবার্থ সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য, কেবল নির্দিষ্ট কোন সময় ও নির্দিষ্ট কোন গোত্রের জন্য প্রযোজ্য নয়। আর আয়াতের সাথে লেখকের সম্পর্ক হচ্ছে, তিনিও আহলে হাদীস, আর আমরাও আহলে হাদীস হওয়ার সুবাদে একটা নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক আছে।

প্রকাশ থাকে যে, বইটি পড়ে আর যা বুঝলাম, মাননীয় লেখকের মতামত যাঁরা স্বীকার করেন না, স্বভাবতঃ তাঁদেরকে তিনি প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং তাঁদের প্রতি কটুক্তি করেছেন। এখন আমার প্রশ্ন হল, যখন আমার দাবির স্বপক্ষে আমার দলীল বা প্রমাণাদি দৃঢ় ও মজবুত হবে, তখন প্রতিপক্ষকে কটুক্তি ও গালি-গালাজ করার ওযর থাকে কোথায়? আরো প্রশ্ন হল; প্রতিপক্ষের যুক্তি ও দাবির খন্ডনে তাদেরকে পরিবারগতভাবে গালি দেয়া কি জ্ঞান-সম্মত? এ সম্পর্কে ইসলামের কি কোন দিক-নির্দেশনা নেই? নাকি প্রতিপক্ষকে যা ইচ্ছা তা বলা জায়েয বা বৈধ? এমনকি প্রতিপক্ষ যদি ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হয়, তবুও তো তাদের সাথে তর্কে বা তাদের দাবি খন্ডনে গালি-

গালাজের আশ্রয় নেয়া বৈধ নয়, এটা ইসলামের শিষ্টাচারও নয়। আর যদি আপনার প্রতিপক্ষ মুসলিম হয়, আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তাদেরকে গালি দেয়া ও তাদের প্রতি কটুক্তি করা কতখানি ইসলাম অনুমোদিত, সেটা বলার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

এখন মাননীয় লেখকের কটুক্তির কিছু নমুনা আংশিকভাবে শিরোনামাকারে পেশ করছিঃ

(১) মাননীয় লেখক তাঁর বইয়ের ৪৫ পৃষ্ঠায় শিরোনামাকারে লিখেছেন, '**কেবল একজন মুহাদ্দিস......।**'

এখানে আল্লামা নাসেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর প্রতি চরমতম কটুক্তি ও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। মাননীয় লেখক আল্লামা (রহঃ)-এর ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'কেবল একজন মুহাদ্দিস, যাকে নিয়ে খুব হৈ চৈ। তিনি, আবুল ফারাজ ইবনে জাওযীর মত খোঁচা মেরে, দোষ ধরে, উক্ত হাদীসটি উচ্ছেদ করতে চেয়ে, নিজে সিকাহ-আস্থাভাজক (?) সেজে ইসলা-মে ফাটল ধরাতে চেয়েছেন -- আর তিনি হচ্ছেন, আ-ল্লা-মাহ মুহাম্মাদ না-সিরুদ্দীন আল-বানী।'

আবার কয়েক লাইন পরে লিখেছেন, 'হা-শা-লিল আলবানী! আল্লাহ তার ভালো করুন।'

মাননীয় লেখক এখানে দুইজন মুহাদ্দিসের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন এবং জঘন্য অপরাধ করেছেন তাঁদের উপর মিথ্যা অপবাদের বোঝা চাপিয়ে। একজন আহলে হাদীস লেখক হয়ে এত বড় মিথ্যা কথা লিখতে পারলেন!? এ ধরণের কথা একমাত্র বিদআতী, শিয়া ও রাফেযারাই লিখতে পারে। আর আপনি আহলে হাদীস দাবীদার হয়ে কি করে লিখতে পারলেন অবাক লাগে? আর এটাই কি প্রতিবাদ ও প্রতিপক্ষের যুক্তি ও খন্ডনের ভাষা? আমার মনে হয় মাননীয় লেখক তাঁদের সম্পর্কে বিশেষ করে আল্লামা আলবানী সম্পর্কে কিছুই জানেন না। যদি জানতেন, তাহলে এ রকম দুঃসাহসিকতার পথ অবলম্বন করতেন না এবং তাঁকে মওলানা আবুল কালাম আযাদের সঙ্গে তুলনা করতেন না।

পৃথিবীতে এমন কিছু কাজ করা হয়, যেখানে মেধা ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, আর তা হচ্ছে, গীবত বা পরনিন্দা, পরচর্চা ও মিথ্যা অপবাদ। এমনকি গীবত বা পরনিন্দা পরচর্চা ও মিথ্যা অপবাদ কাকে বলে তাও হয়তো তিনি জানেন না। যদি জানতেন, তাহলে তিনি লিখতেন না। যা তিনি লিখেছেন, তা যদি সমুদ্রের পানিতে মিশিয়ে দেওয়া হয় সমস্ত সমুদ্রের পানি বিষাক্ত হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাবে।

আরো মনে হয় মাননীয় লেখক তাঁর অসার, অনর্থক ও অচল কথাগুলিকে সমাজে সচল করার লক্ষ্যে নিজেকে 'আস্থাভাজন' ভেবে মহামান্য আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে কথাগুলি লিখেছেন।

তাই মাননীয় লেখককে স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে যে, এগুলি মিথ্যা অপবাদ ও অসার ক্রিয়া-কলাপ এবং গীবত বা পরনিন্দা ও পরচর্চা, যা আপনার সহীহ আমলকে বিনষ্ট করে দিবে, তা থেকে সতর্ক ও বিরত থাকার জন্যে আল্লাহর ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর কিছু বাণী নমুনাকারে পেশ করছি, যা আমাদের সকলের পক্ষে উপদেশ এবং তা ইহ-পরকালে সুখ ও শান্তি বয়ে আনবে ইন শা-আল্লাহ। আল্লাহ বলেন;

(وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) (٥٥) سورة الذاريات

অর্থ: এবং তুমি উপদেশ দিতে থাক, নিশ্চয়ই উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে। *(সুরা যারিয়াত ৫৫)*

যাই হোক মাননীয় লেখক যদি প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা অপবাদ ও পরনিন্দা পরচর্চার শাস্তি কিরূপ ভয়ংকর জানতেন, তাহলে কোন দিন দুঃসাহসিকতার কলমের কালি নিয়ে খেলা করতেন না ও কুরুচিকর কথা লিখতেন না এবং শায়খ আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেবের সম্মান ও ইজ্জত নিয়ে মানহানিকর মন্তব্য করার দুঃসাহসিকতা দেখাতেন না।

যদি বলেন, 'সে আমার বদনাম আগে করেছে', তাহলে আমরা বলব,

(ক) তিনি আপনার নামে বদনামির বই লিখেননি।

(খ) যিনি লিখেছেন, তিনিও আপনার নামে কোন মিথ্যা অপবাদ দেননি। আপনার স্ত্রী বা বাপ তুলে কোন মন্তব্য করেননি।

(গ) আপনিই সবার আগে আপনার অগাধ পান্ডিত্যের নমুনা দেখিয়ে যাঁরা ফরয নামাযের পর জামাআতী মুনাজাত করেন না, তাদের বিরুদ্ধে 'দুয়ায়ে হাকিম' বই লিখে তাঁদের বদনামি ছড়িয়েছেন। পৃথিবীর গণ্যমান্য সকল উলামাকে 'আবু জেহেল, বিদআতী' ও 'ফিতনাবাজ' বানিয়েছেন! যে সকল অপবাদের খন্ডন ঐ জবাবী বইয়ে করা হয়েছে।

আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আল্লাহর রাসুল ﷺ মিনায় বলেছিলেন; "আজ কোন্ দিন তোমরা কি জানো?" লোকেরা বলল, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল বেশী জানেন।' তিনি বললেন, "নিশ্চয় আজ হারাম বা মর্যাদাপূর্ণ দিন।" অতঃপর বললেন, "এটা কোন্ শহর তোমরা কি জানো?" লোকেরা বলল, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল বেশী জানেন।' তিনি বললেন, "হারাম বা মর্যাদাপূর্ণ শহর।" অতঃপর বললেন, 'এটা কোন্ মাস তোমরা কি জানো?' লোকেরা বলল, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল বেশী জানেন।'

তিনি বললেন, 'হারাম বা মর্যাদাপূর্ণ মাস।' তারপর বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, যেমন তোমাদের নিকট আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর হারাম ও মর্যাদাপূর্ণ।' *(বুখারী ৫/২২৪৭)*

সুতরাং হাদীস থেকে বুঝতে পারা গেল যে, কারো সম্মান নিয়ে খেলা করা ও সম্মান হরণ করা অতি মহাপাপ, তাই মাননীয় লেখকের উচিত, সহীহ তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

এখন আলোচনা করব, আল্লামা আলবানী (রহঃ) সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের অভিমত ঃ-

১। শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আ-লে শায়খ (রহঃ) বলেন, আল্লামা আলবানী হচ্ছেন, 'সুন্নাতের অনুসারী, সত্যের সাহায্যকারী এবং বাতিলের বিরুদ্ধে অগ্রগামী সংগ্রামী।' *(ইমাম আলবানী ২১৭পৃঃ)*

২। শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) সউদী আরবের প্রাক্তন গ্রান্ড্ মুফতী আল্লামা আলবানী সম্পর্কে বলেন, 'তিনি হচ্ছেন, প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াতের অনুসারী, সুন্নাতের সাহায্যকারী, সুন্নাতের বাণী বাহক এবং সুন্নাত সংরক্ষণ করার ব্যাপারে তিনি হচ্ছেন একজন মুজাহিদ।' *(ঐ ২১৭পৃঃ)*

৩। শায়খ ইবনে বায (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'রাসুল (সঃ)-এর ঐ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে---যাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জন্য প্রতি একশত বছরের শুরুতে তার দ্বীনকে সংস্কার ও জাগ্রত করার লক্ষ্যে একজন করে মুজাদ্দিদ (সংস্কারক)রূপে প্রেরণ করবেন। তাহলে এই যুগের সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ কে?' তিনি বলেছিলেন, 'আমার জ্ঞান মতে এই যুগের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক হচ্ছেন আল্লামা আলবানী (রহঃ)।' *(ঐ ২১৮পৃঃ)*

৪। শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসায়মীন (রহঃ) আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর সম্পর্কে বলেন, 'তিনি সুন্নাতের অনুসারী ও বিদআতের প্রতি বিদ্রোহী।' *(ঐ ২১৮পৃঃ)*

৫। সউদী আরবের বর্তমান গ্রান্ড্ মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আল-শায়খ আল্লামা আলবানী সম্পর্কে বলেন, 'তিনি হচ্ছেন এই যুগের সুন্নাতের সাহায্যকারী।' *(ঐ ২১৯পৃঃ)*

আল্লামা আলবানী (রহঃ) সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের অভিমত এখানে সমাপ্তি করলাম। কারণ, তার সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের অভিমত পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করতে গেলে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) পৃষ্ঠার থেকে বেশী হবে তাই উল্লেখিত মাত্র চারজন বিজ্ঞ উলামার অভিমত পেশ করলাম। কেননা, যাঁরা সারা পৃথিবীর আলেম সমাজের নিকট প্রসিদ্ধ।

(ইমাম আলবানী বইটির লেখক আঃ আযীয বিন মুহাম্মাদ আল-সাদহান) *(মাকতাবাহ মালিক ফাহাদ আল-অত্বানিয়্যাহ / রিয়াদ / সউদী আরব / ১ম সংস্করণ ১৪২৯ হিঃ)*

আসলে 'ক্বাদরে গুল বুলবুল মী দানদ, ক্বাদরে গাওহর গাওহরী।' অর্থাৎ, ফুলের কদর বুলবুল জানে, মণি চেনে মণিকার।

(২) মাননীয় লেখক তাঁর বইয়ে 'হাদীস কাকে বলে' এর 'ভূমিকা' কলামে লিখেছেন, 'যে নিজের বাপকে বাপ বলে নাই, পরের বাপকে বাপ বলে, যে নিজ জম্মভূমি ভুলে গিয়ে মাদানী নামে পরিচিতি দেয়, সে ভারাটিয়া লেখক.....!'

এখানে মাননীয় লেখক চারটি কথা বলেছেন, তা যদি সত্য হয়, তাহলে আপনার নিকট প্রশ্ন আছে! আর যদি মিথ্যা হয়, হিংসার বশবর্তী হয়ে অহংকারের চাদর গায়ে দিয়ে লিখেছেন, তাহলে যাঁদের সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁদের ব্যাপারে পুনরায় বই লিখে তাঁদের নিকট ও সমাজের মানুষের নিকট ক্ষমা চান। নচেৎ তাঁরা এর বদলা আপনার নিকট ইহ-পরকালে উভয় জায়গাতেই নিবেন---ইন শা-আল্লাহ।

যদি অপরের নিকট শুনে সত্য মনে করে লিখে থাকেন, তাহলে আপনাকে সত্যবাদী সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করাতে হবে যে, তিনি কার নিকট বলেছেন? কোথায় বলেছেন? কেন বলেছেন? তবে সাক্ষী হতে হবে আপনার ভাষায় 'আস্থা-ভাজক'। মিথ্যুক, বেনামাযী, হারামখোর ও কাবীরা গোনাহ করা ব্যক্তিবর্গের সাক্ষী গ্রহণীয় হবে না। **কেননা এ ধরণের কথাগুলি হচ্ছে মিথ্যা অপবাদ**। আর মিথ্যা অপবাদ কাকে বলে, তা অবশ্যই আপনি জানেন। তার শাস্তি কি তাও জানেন। আল্লাহর কালাম কি পাঠ করেন না? শুনুন আল্লাহ কি বলছেন,

{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}

অর্থ, ম'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলা কোন অপরাধ না করা সত্ত্বেও যারা তাঁদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহ্যাব ৫৮)*

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}

অর্থ, যে বিষয়ের তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে (অনুমান দ্বারা) মন্তব্য কর না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা ইসরা ৩৬)*

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার জন্যে নিজের জিহ্বা ও গুপ্তাঙ্গের যামিন হয়, আমি তার জন্যে জান্নাতের যামিন হব। *(বুখারী ৫/২৩৭৬)*

প্রকাশ থাকে যে, কলমের শক্তি এমন, যা বিচ্ছিন্ন সমাজকে এক করতে পারে।

আবার এর দ্বারা সমাজ খন্ড-বিখন্ড হয়ে যায়। এই কলমের দ্বারা মানুষ সত্যের দিশা পায় আবার এর দ্বারা মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এর দ্বারা ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়ে যায়। আবার এর দ্বারা দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর দ্বারা দেশে আগুনও জ্বলে, আবার এর দ্বারা মিথ্যা ও জালিয়াতি চিরতরে বিতারিত হয় এবং সত্যের বিজয় হয়।

অতএব মাননীয় লেখক সাহেবের নিকট বিনীত আবেদন এই যে, কলমের কালি খরচ করার পূর্বে পাত্র-অপাত্র সম্পর্কে জেনে ঝোঁপ বুঝে কোপ মারুন। নচেৎ সেই কলমের কালিই একদিন বিষধর সাপের রূপ নিয়ে আপনাকে দংশন করবে! কেননা, সত্যের কলম কোন দিন পরাজিত হয় না। হয়তো বা কোন সময় বিলম্বিত হয়; কিন্তু সত্যের বিজয় অবধারিত। তাই বলি, রাসুল ﷺ-এর এই হাদীস অনুধাবন করুন, সকলের মঙ্গল হবে ইন শা-আল্লাহ।

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন; 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।' *(বুখারী ৫/২৩৭৫)*

উক্ববা বিন আ-মের ﷺ বলেন, আমি বললাম, 'মুক্তি কোথায় হে আল্লাহর রাসুল!' তিনি বললেন, 'তোমার জিহ্বাকে অন্যায় থেকে বিরত রাখ, তুমি তোমার ঘরকে প্রসস্ত মনে কর, আর তোমার কৃত পাপের জন্য কান্না করা।' *(তিরমিযী ৪/৬০৫)*

(৩) মাননীয় লেখক তাঁর বইয়ে 'হাদীস কাকে বলে' এর 'ভূমিকা' কলামে লিখেছেন, 'যে নিজ জন্মভূমি ভুলে গিয়ে মাদানী নামে পরিচিতি দেয়, সে ভারাটিয়া লেখক......।'

এখন প্রশ্ন হলো, এই লেখক কে? যিনি ভাড়াটিয়া? কার ভাড়া খাটেন? আপনার বড় ভায়ের, না অন্যের? অথবা আপনার স্বার্থে কোথাও আঘাত লেগেছে নাকি?

এই লেখক কি আপনার বড় ভাই মুহতারাম আব্দুর রউফ শামীম (রহঃ)-এর জামাতা নন? আর আপন সহোদর বড় ভাইয়ের জামাই মানেই নিজেরই জামাই। আর নিজের জামাইয়ের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাঁকে উলঙ্গ করলেন? একেই বলে 'ঘরের শত্রু বিভীষণ। ঘরের ঢেঁকি কুমীর।' সে যাই হোক, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সত্যকে আটকানো যায় নি এবং ভবিষ্যতেও কোনদিন যাবে না---ইন শা-আল্লাহ। মুহতারাম মাদানী সাহেব তিনি আপনার ভাড়াটিয়া (মনঃপূত) লেখক হতে পারেন নি বলেই এই সর্বনাশা অন্ধ আক্রমণ! তিনি পৃথিবীর কোন মানুষের ভাড়াটিয়া লেখক নন; বরং তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর ভাড়াটিয়া। আর তিনি দ্বীনের সঠিক কথা লিখছেন, এই জন্যেই তাঁর উপর বিষধর সাপের ছোবল। কিন্তু এই তাওহীদের একনিষ্ঠ লেখকের

লেখাকে কোন দিন কোন মানুষের পক্ষে স্তব্ধ করা সম্ভব নয়। কেননা, তাঁর সাথে আল্লাহ এবং সৎ ও একনিষ্ঠ উলামায়ে কেরামগণ আছেন। এই রকম যতই মিথ্যা অপবাদ আসুক না কেন, ততই তাঁদের ক্ষুরধার লেখনীর গতি আরো তীক্ষ্ম থেকে তীক্ষ্মতর হবে ইনশা-আল্লাহ। আর আপনাদের মত হিংসুটে মনোভাব সমাজের মাঝে ততই পরিষ্কার হয়ে উঠবে এবং সমাজ জানতে পারবে যে, ভাড়াটিয়া লেখক কে!

আপনি হয়তো আমাদেরকেও 'মাদানীর চামচা' বলতে পারেন; যেমন শায়খ আব্দুল্লাহ সালাফী সাহেবকে বলেছেন। কিন্তু আমি বলি, প্রথমতঃ এটাও একটি অপবাদ। আর দ্বিতীয়তঃ আমি তাঁর ছাত্র। হক প্রকাশে তাঁর চামচা হওয়া আমার সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর তিনি আমার ওস্তায শায়খুল হাদীস সাহেবের চামচা বলেই, আপনি আমাদেরকে তাঁর চামচা ও দালাল বানিয়ে দিলেও---এ অপবাদ আমরা আনন্দের সাথে গায়ে মেখে নিবো।

আপনি কি আল্লাহর রাসুল (সঃ)-এর এই হাদীস পড়েন নি? আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন, "প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির ঐ আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে। *(বোখারী ১/১৩)*

পরিশেষে বলি,

'করাতের কঠোরতা দেখেছে সকল নর কাঠের উপরে
তার চেয়ে বেশী বাজে কঠোর কর্কশ স্বর মনের ভিতরে।'

(৪) মাননীয় লেখক তাঁর বইয়ে (৬০পৃঃ) লিখেছেন, 'যে হামীদ সাহেব স্বীয় ভার্জার (?) পৃষ্ঠদেশে ......।'

আপনি যে কত রাগান্বিত শায়খ আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেবের উপর তা উল্লিখিত উক্তি থেকে স্পষ্ট। কেননা, আল্লাহর গুণবাচক নাম 'আল-হামীদ' আর আপনি রাগ, হিংসা, ঘৃণা ও অহংকারের বশবর্তী হয়েই 'আব্দুল' বাদ দিয়ে লিখে ফেললেন 'হামীদ সাহেব'। সমাজে আপনার এই কু-রুচিকর লেখার মর্যাদা মানুষ দিবে না। আপনার এই লেখা আপনারই উপরে অভিশাপের বোঝা বয়ে আনবে। যাই হোক যে কথা আপনি লিখেছেন, আপনি কসম করে বলতে পারবেন যে, শায়খ আব্দুল হামীদ সাহেব ঐ সময় ঐ স্থানে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার সামনে এই চিকিৎসা সংঘটিত হয়েছে? বলতে পারবেন না! কারণ এগুণ আপনাদের পরিবার ও পরিবেশের। এখানে আপনি হিংসা ও অহংকারের চাদর গায়ে নিয়ে লিখেছেন, যাতে শায়খ আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেব সমাজের চোখে ছোট ও অপদস্থ হন, আর তাঁর লেখা যেন কেউ না পড়ে। কিন্তু কথা

হচ্ছে, হিংসা ও অহংকার করে কিছু করা সম্ভব নয়; বরং ক্ষতি তো হিংসুকদেরই হয়। সুতরাং এ ধরণের কথা লিখে শায়খ আব্দুল হামীদ মাদানীর সত্যের কলম রুখতে পারবেন না---ইন শা-আল্লাহ। আপনি কি আল্লাহর এই বাণী পড়েন নি? তাহলে শুনুন আল্লাহর বাণী;

{وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ } (٣٢) سورة النساء

অর্থ, তোমরা ওসবের আকাঙ্ক্ষা করো না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে অন্যের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। *(সূরা আন-নিসা ৩২)*

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, তোমরা হিংসা করা থেকে সাবধান, নিশ্চয়ই হিংসা ভালো কর্মগুলি খেয়ে (নষ্ট করে) ফেলে যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে নেয়। *(আবু দাউদ ৪/৪২৭)*

আপনি যদি সত্যিকারে সত্যের পৃষ্ঠপোষক হতেন, তাহলে অবশ্যই যখন এই কর্মকান্ড হতে দেখেছেন, তখনই বাধা দিতে পারতেন। আপনি কি আল্লাহর রাসুল (সঃ)-এর এই হাদীস পড়েন নি?

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ যদি কাউকে কোন খারাপ কর্ম করতে দেখে, তাহলে তা হাত দিয়ে বাধা দিবে, তার শক্তি যদি না থাকে, তাহলে তা কথার মাধ্যমে বলবে আর তারও যদি শক্তি না থাকে, তাহলে তা অন্তরে ঘৃণা করবে। আর তা হচ্ছে সব থেকে দুর্বলতম ঈমান।' *(মুসলিম ১/৬৯)*

কিন্তু আপনি তো দেখেননি; বরং নিসায়ী হাদীস থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আর তাও হয়তো আপনার কাছে 'সিহা সিত্তা'র একটি।

আপনার কি কোন ত্রুটি নেই? আর আপনি কি চান যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ আপনার ত্রুটি সকলের সামনে প্রকাশ করে দেন ?

আপনি নিজের ভাইঝির কথা যে সমাজে প্রচার করলেন, তা বাস্তব হলেও নিজের পরিবারের কোন দোষ কি প্রচার করতে হয়? আপনি কি আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর এই হাদীস অধ্যয়ন করেননি?

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ত্রুটি গোপন করে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তার ত্রুটি গোপন করবেন।' *(ইবনে মাজাহ ২/৮৫০)*

(৫) মাননীয় লেখক তাঁর বইয়ে (৩১ পৃঃ ৫৪ কলামে) লিখেছেন 'দুটো সন্তানই দুর্বল-যায়ীফ সন্তান তো বটে? জারজ নয় (মওযূ নয়)।'

মাননীয় লেখকের নিকট প্রশ্ন হলো, হাদীসকে সন্তানের সাথে তুলনা করা কি সঠিক হয়েছে? ইতিপূর্বে কোন সলফ থেকে কি এর কোন প্রমাণ আছে? শরীয়ত নিয়ে কি

এভাবে খেলা করবেন? কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে এর উত্তর কি দিবেন? হাদীসকে সন্তানের সাথে তুলনা করতে রুচিতে একটু বাধলো না? মা-বাপ তার সন্তানদের কোন দিন ফেলতে পারবে না, সে সন্তান কানা অথবা বোবা অথবা পাগলও হয়। আর পৃথিবীতে এই সন্তান ফেলার দৃষ্টান্ত ও নমুনাও নেই কিন্তু হাদীস যদি অতি দুর্বল ও জাল হয়, তাহলে তা ফেলার ব্যাপারে পৃথিবীর কোন মুহাদ্দিসের দ্বিমত নেই। কেননা ইসলাম হচ্ছে খালেস ও স্বচ্ছ এক গ্লাস দুধের ন্যায় যার মধ্যে কোন ভেজাল নেই। আর যায়ীফ ও জাল হাদীস হচ্ছে, ইসলামের জন্য ক্যানসারস্বরূপ, যাকে ফেলা ছাড়া ইসলামকে সঠিক মানদণ্ডে ওজন করা সম্ভব নয়। তাই আপনার নিকট বিনীত নিবেদন যে, 'হাদীস কাকে বলে' সে ব্যাপারে আপনি আগে জানুন তারপর কলম ধরবেন। কেননা, পানি না দেখে কাপড় তুললে লোকে যেমন পাগল বলবে, ছোট মুখে বড় কথা বললে, লোকে যেমন বেআদব বলবে, তেমনি হাদীস সম্পর্কে না জেনে মুহাদ্দিসের মত কথা বললে বড় আলেমদের কাছে আপনি হাসির পাত্র হবেন।

আপনার সাবানের কষ্টিক সোডায় যে ভেজাল নেই, তার গ্যারান্টি কোথায় পেলেন?

আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেন; মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, তাই (নির্বিচারে) বর্ণনা করে। *(মুসলিম ১/১০)*

অতএব আমাদের বিনীত নিবেদন যে, অনুমান করে 'ওমুক মাওলানা সাহেব কি কিছু জানতেন না'---এ ধরণের কথা না বলে, সত্যতা যাঁচাই করার পর বললে ইহ-পরকালে নাজাত পাওয়া যাবে, অন্য কোন অবস্থাতে সম্ভব নয়।

(৬) মাননীয় লেখক তাঁর বইয়ে (৭১পৃঃ) লিখেছেন ''হায়রে আমার কতিপয় লেখক মাদানী'' মাননীয় লেখক 'মাদানী লেখক' বলতে কি বুঝাতে চেয়েছেন, তা তো বোধগম্য নয়? পরিষ্কার করে বললে সকলেই বুঝতে পারতেন। মাদানী লেখা কি অন্যায়? মাদানীদের উপর আপনার এতো আক্রোশ কেন? মাদানীরা কি আপনার হাঁড়ির ভাত কেড়ে খাচ্ছে নাকি? আসল কথা হলো, মাদানীরা যা লেখেন, তা হয়তো আপনার চিরাচরিত ধারণার বিরোধী বলেই এ ধরণের প্রহসনমূলক মন্তব্য। তার কারণ হচ্ছে, আপনাদের মত আলেমরা সমাজকে বোকা বানিয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিলো, আর সে আধিপত্য বর্তমান সমাজ অবজ্ঞা করছে বিধায় এখন কলমের কালিতে হিংসার বিষ মিশিয়ে নিয়ে এই শাণিত আক্রমণ, যাতে মানুষ পুনরায় আপনাদেরকে একচ্ছত্রভাবে মনের কোণে আসন দেয়। কিন্তু তা কখনও সম্ভবপর নয়। কেননা মানুষ হচ্ছে, আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন এবং দান করেছেন ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা। আর সত্য

প্রকাশ হওয়ার পর কোন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি আপনাদের ভেজাল মিশ্রিত মসলা গ্রহণ করতে পারেন না। তার সাক্ষী স্বয়ং কুরআন কারীম। আল্লাহ বলেন,

وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (٨١) سورة الإسراء

অর্থ, বল, সত্য এসেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হয়েই থাকে। *(সূরা বানী ইসরাঈল ৮১)*

পরিশেষে বলি, আপনি যে সমস্ত আলেমগণের নাম আপনার ওস্তাদ হিসাবে আপনার বইয়ে উল্লেখ করেছেন, তাঁদেরকে আমরা কোন দিন ছোট করে দেখি না, বরং তাঁদেরকে আমরা সব সময় আমাদের মাথার উপরে রাখি এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা ছিলেন মানুষ আর মানুষ কোন দিন ভুলের উর্দ্ধে নয়। অতএব সহীহ হাদীস যখন সামনে আসে, আর তাঁদের আমল যদি যয়ীফ হাদীসের উপর হয়ে থাকে, তখন আমরা তা গ্রহণ না করে সহীহ হাদীসকে গ্রহণ করি মাত্র। আর এ কারণে তাঁদের সম্মানে হ্রাস পায় বলে মনে করি না এবং কোন শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও তা মনে করবেন বলে মনে হয় না। কুরআন ও সহীহ হাদীস ব্যতীত শরীয়তের ব্যাপারে কোন মানুষ দলীল হতে পারে না।

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন, "আমি তোমদের মাঝে দুটি বস্তু ছেড়ে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে থাকবে, পথভ্রষ্ট হবে না আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) আর তাঁর নবীর সুন্নাত (হাদীস)। *(মুঅত্তা ২/৮৯৯)*

আর প্রত্যেক ইমাম বলে গেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।' আশা করি আপনার ওস্তাযগণও তাই বলেন। বাকী আপনি তার ব্যতিক্রম হলে হতে পারেন।

আল্লাহ সকলকে হিদায়াত দিন। আমীন।

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.

শূন্যের পাশে শূন্যের কি মান?

শায়খ সফিউর রহমান রিয়াযী
ফরেনার গাইডেন্স্ সেন্টার, মারাত

যুগ যুগ ধরে ইসলামের কিছু বিষয়ে উলামাদের মতবিরোধ রয়েছে এবং থাকবে। কিন্তু ফরয নামাযের পর ইমাম সাহেবের দুই হাত তুলে দুআ করা ও মুক্তাদীদের 'আমীন-আমীন' বলার যে রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত হয়েছে, সহীহ সুন্নাহতে তার কোন প্রমাণ নেই; কুরআনে তো দূর আস্ত। তা প্রমাণ করতে গিয়ে কাদা

ছুঁড়াছুঁড়ি করা তো মোটেই শোভনীয় নয়। আর কারো ব্যক্তিত্ব ও পরিবারের উপর আক্রমণ করা এবং তার মান-সম্মানের উপর আঘাত হানা কোন আলেম তো দূরের কথা কোন সাধারণ মুসলমানের জন্যও তা বৈধ নয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও তার মান-সম্মান অপর মুসলমানের জন্য হারাম।" *(মুসলিম)*

'ঘোড়ার লাগাম যদি পাছাতে দেয়, তাহলে বলার কিছু নাই।' কথাটা যদি সত্য হয়, তাহলে এত রাগ কেন? নাকি এর আড়ালে নিজের কিছু অভিলাষ চরিতার্থ করতে চান তিনি?

'এক বিষয়ী হাদীস ক্রমাগত বর্ণিত হতে থাকলে, তা যয়ীফ হলে তা আর যয়ীফ থাকে না। তা মুতাওয়াতার (?) বা সহীহ হয়ে যায়!' কথাটি কোন্ মুহাদ্দিসের? তা জানার আগ্রহ থাকল। এক লক্ষ শূন্য পাশাপাশি লিখলে কি সংখ্যার কোন মান বাড়ে?

কোন আলেম দ্বারা কোন আমল হয়ে থাকলে, তা শরীয়তে আছে বলে প্রমাণ হয় না। কারণ কোন আলেম শরীয়তের দলীল নয়। শরীয়তের একমাত্র দলীল হল কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) তো আর কম বড় আলেম ছিলেন না; বরং একজন ইমাম ছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর কথা মেনে নিতে পারি নি।

'আমি বিদআত হাসানা মানি।' অথচ রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা।" এখানে বিদআতকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় নি। আর আপনি 'হাসানা' বলে মেনে নিলেই তা 'হাসানা'য় পরিণত হয়ে যায় না। তাছাড়া উমার ؓ-এর 'নি'মাতিল বিদআতু হাযিহ' উক্তিতে 'বিদআতে হাসানাহ' উদ্দিষ্ট ছিল না। বরং তা ছিল আভিধানিক অর্থে বিদআত বা অভিনব, শরয়ী অর্থে নয়। যেহেতু তারাবীহর জামাআতের দলীল বর্তমান ছিল। খোদ রসূল ﷺ তারাবীর নামায পড়েছেন। আর আপনার 'বিদআত হাসানা'র তো কোন দলীলই নেই।

'মক্কা মুকার্রামায় ঐ আবরণ বা গেলা-ফ, যারা বিদআত নিয়ে লাফালাফি করছে, তাদেরকে ঐগুলি নিঃশ্চিহ্ন (?) করার আহবান করি।'

তার মানে কি কা'বা শরীফের গিলাফকেও বিদআত বলছেন? অথচ তা তো নবী ﷺ-এর যুগেই ছিল। তাহলে কেন এ অন্ধকার? নাকি আরবের প্রতি ঘৃণা একেবারে অন্ধ ক'রে ফেলেছে?

আপনি বিদআত নিয়ে লাফালাফি করেন না? কেমন আলেম তাহলে আপনি?

আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি দিন এবং সঠিক জ্ঞান লাভের তওফীক দিন। আমীন।

দুয়া ছেড়ে দুয়ো কেন?

শায়খ মুহাম্মাদ হাশেম মাদানী
ফরেনার গাইডেন্স্ সেন্টার, আয্-যুলফী

'দুআ কেন্দ্রবিন্দুয় সবার লক্ষ্য'-এর লেখককে আগে জানতাম না। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে, তিনি হচ্ছেন, আমার শ্রদ্ধেয় উস্তায আব্দুর রউফ শামীম সাহেবের ছোট ভাই। আমি তো লেখার ঢঙ দেখে মনে করেছিলাম, বইটা হানাফী মাযহাবের কোন বিদআতী আলেমের আহলে হাদীসদের বিরুদ্ধে লেখা হবে। কারণ, বইটির ভাষাগুলো থেকে বিদআতের পচা গন্ধ আসছিল। তাছাড়া সাধারণতঃ বিদআতীরা এইভাবেই লেখে। তারা তাদের বুযুর্গানে দ্বীনদেরকেই সবচেয়ে বড় দলীল মনে করে। কিন্তু অবাক হলাম যখন জানলাম যে, সম্মানিত লেখক একজন আহলে হাদীস মৌলবী-মাষ্টার। যে আহলে হাদীস আলেমদের প্রতিবাদী কলম কেবল শির্ক ও বিদআতের মূলোৎপাটনেই চলে এবং যাদের প্রতিবাদী কণ্ঠ শুধু শির্ক ও বিদআতের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকে। তাদেরই এক ভাই কিভাবে বিদআতের সমর্থনে ও তার প্রতিষ্ঠায় অন্ধের মত কলম চালিয়ে আবোল-তাবোল লিখে ফেললেন---তা ভাবাই যায় না।

হাদীসে আছে, মানুষ মারা গেলে তার নেকীর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজের নেকী অব্যাহত ধারায় মৃত ব্যক্তি পেতে থাকে। তার মধ্যে একটি হল, ফলপ্রসূ জ্ঞান। যে জ্ঞান দ্বারা সমাজের মানুষ উপকৃত হয়, সে রকম জ্ঞান যদি কেউ ছেড়ে যায়, তাহলে সে মৃত্যুর পরও নেকী পাবে। আর দ্বীনী বই-পুস্তকও উপকারী জ্ঞানের আওতাভুক্ত জিনিস। কাজেই আল্লাহ কাউকে কোন কিছু লেখার তাওফীক্ব দান করলে তার উদ্দেশ্য যেন হয় সমাজের মানুষের কল্যাণ সাধন এবং সঠিক দ্বীনের প্রচার-প্রসার।

সম্মানিত লেখকের এই বই কি উপকারী জ্ঞান ও দ্বীনের প্রচার-প্রসারের আওতায় পড়ে? তাতে আবার তিনি আব্দুল হামীদ মাদানী এবং আব্দুল্লাহ সালাফীর বিরুদ্ধে যে আক্রোশ পোষণ করতেন তারই বিষ উদ্গারণ করেছেন। আব্দুল হামীদ মাদানীর ব্যক্তিগত ও তাঁর পারিবারিক অবাস্তব কিছু বিষয়কে তুলে ধরে তাঁকে সরাসরি আক্রমণ করেছেন। দোষ যদি আসলেই থাকে তবুও তা প্রচার না ক'রে ঢাকার নির্দেশ দিয়েছে শরীয়ত। যে মুসলিম তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ

ঢাকে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন। সত্য দোষকে ঢেকে রাখার এই ফযীলত। তাহলে যে মিথ্যা অপবাদ দেয় তার কি হবে? আলেম হয়ে আলেমের প্রতি এ বিদ্বেষ কেন? আলেমদের মাংস যে বিষাক্ত তা কি তাঁর জানা নাই? আর যে আলেমদের মানহানী করে তার সাথে আল্লাহ কি আচরণ করবেন--- তাও কি তিনি জানেন না?

মওলানা আব্দুল্লাহ সালাফীর লেখাতে তাঁর মানহানি হয়েছে। কিন্তু তা তো পারিবারিক নয়। নাকের বদলে নাক না নিয়ে নরুনের বদলে নাক কেন? দুয়ার বদলে দুয়ো কেন? বরং এর জন্য তিনি বিরোধীকে হিদায়াতের দুআ দিতে পারতেন।

লেখকের লিখনী থেকে এ কথাও ফুটে উঠেছে যে, তিনি মাদানীদের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করেন। কেন এ বিদ্বেষ? মাদানীরা তো কারো পাতের ভাত কেড়ে খান না, তবুও এ বিদ্বেষ কেন? নামের শেষে 'মাদানী' লেখা হয় বলেই কি? দোষ কিসের? দিল্লীর রাহমানিয়া থেকে যাঁরা ফারেগ হয়েছেন তাঁরা লিখেন, 'রাহমানী'। মিসরের আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা ফারেগ হন তাঁরা লিখেন, 'আযহারী'। জামিয়া সালাফিয়া বানারস থেকে যাঁরা ফারেগ হন তাঁরা লিখেন 'সালাফী'। এভাবেই মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা ফারেগ হন তাঁরা লিখেন 'মাদানী'। এতে দোষের কি আছে? আপনিও তো 'রিয়াযী' আবার তার সাথে 'আলিয়াবী' লিখেছেন। অবশ্য সম্মানিত লেখকের মত আরো কিছু হিংসুক আলেম আছেন, যাঁরা মাদানীদের প্রতি চরম বিদ্বেষ এবং সতা-সতিনের মত শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করেন। কারণ, তাঁদের স্বার্থের মূলে আঘাত হানেন মাদানীরা। তাবীয, চল্লিশা এবং আরো অনেক বিদআতী কার্যকলাপের মাধ্যমে হারাম উপায়ের পথ বন্ধ করে দিতে চান মাদানীরা। বক্তৃতাকে পেশা ও উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে যে বক্তারা অর্থ উপার্জন করেন তা অবৈধ হওয়ার ফাতওয়া দিয়ে তাদেরও স্বার্থের দুয়ারে হানা দেন মাদানীরা। কাজেই এই ধরনের আলেমদের মাদানীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কয়েক বছর আগের কথা আমি, আব্দুল হামীদ মাদানী এবং ইসমাঈল মাদানী মহিষাডহরী মাদ্রাসার জালসায় গেছিলাম। মাদ্রাসার কোন এক রূমে আমরা বসেছিলাম। বহু মানুষ আমাদেরকে ঘিরে বসেছিল এবং বিভিন্ন প্রশ্নাদি করছিল। আমাদের প্রতি মানুষের এই আকর্ষণ ও ভালবাসা দেখে একজন কমার্শিয়াল বক্তা

নিজেকে অবহেলিত অনুভব ক'রে তাঁর বড় জ্বালা হয় এবং বিদ্বেষে ফেটে পড়ে বলে ওঠেন, 'দাঁড়ান, এখন **"মাদানী না পাদানী"**দেরকে নিয়ে ওরা ব্যস্ত!'

মাদানীদের প্রতি যদি মানুষের ভালবাসা থাকে, তবে তা তো আল্লাহরই দান। এতে জ্বালা হওয়ার তো কোন কারণ নেই।

আমি শ্রদ্ধেয় ভাই শায়খ আব্দুল হামীদ সাহেবকে নসীহত স্বরূপ এ কথাই বলবো যে, আপনি আর সম্মানিত লেখকের প্রতিবাদ লিখতে গিয়ে অমূল্য সময়ের অপচয় করবেন না। কারণ, আল্লাহ বলেছেন, "আর লোকদের সাথে বিতর্ক কর এমন পন্থায় যা অতি উত্তম।" অর্থাৎ, শরীয়তের মাসলা-মাসায়েলকে নিয়ে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করলে তাতে কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু সম্মানিত লেখক যা লিখেছেন তা তো আবোল-তাবোল ও অনর্থক। সুতরাং তার প্রতিবাদ লেখা বা তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার মানে সময়ের অপচয় করা। এতে সমাজের কোন উপকার তো হবেই না, বরং তাদের অন্তরে আলেমদের প্রতি কুধারণা সৃষ্টি হবে। আপনাকে যে সরাসরি আক্রমণ করা হয়েছে তার বিচার আল্লাহর হাতে অতঃপর সমাজের হাতে তুলে দিয়ে ধৈর্যধারণ করুন, অবশ্যই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। আর যদি মনে করেন যে, প্রতিবাদ লিখলে লেখকের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটতে পারে, তবে তা অমূলক ধারণা হবে। কারণ, তিনি গোঁড়া, জেদী এবং একগুঁয়ে। জাহেলী যুগের মানুষের সাথে তাঁর বেশ মিল রয়েছে। তারা যেমন বলত, "বরং আমরা তারই উপর চলব, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি।" তিনিও লিখেছেন, **'আমার আব্বা, আব্বার আব্বার আমলে ছিল না।'** কিছু আলেম-উলামাদের নাম উল্লেখ ক'রে লিখেছেন, **'এঁরাই আমার দলীল।'** একজন আহলে হাদীস আলেমের ভাষা যদি এই হয়, তার প্রতিবাদ লিখতে গেলে সময়ের অপচয় বৈ আর কিছুই হবে না। ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো যায়, কিন্তু যে মিথ্যা ঘুমের ভান করে, তাকে জাগানো বড়ই কঠিন হয়। বুঝে না---তা নয়, বুঝেও জেদের বশবর্তী হয়ে না বুঝার কসম খেয়ে বসে আছে। যেমন, একজন বলল, 'আমাকে যদি কেউ বুঝাতে পারে, তাকে আমি আমার বাড়ীটা দিয়ে দিব।' এ কথা শুনে তার স্ত্রী বলে উঠল, 'বাড়ীটা দিয়ে দিলে আমরা থাকব কোথায় গো?' তখন সে বলল, 'আরে পাগলী, আমি বুঝলেই তো।' অবস্থা এই রকমই, ঐ শ্রেণীর আলেমরা কোনদিন বুঝবে না। তাছাড়া ফিরে আসা তো প্রেস্টিজের ব্যাপার! তাই এঁদের ব্যাপার আল্লাহর হাতে তুলে দিয়ে ধৈর্য ধরাই শ্রেয়। আল্লাহই সাহায্যকারী।

দুআর দুয়ার বন্ধ নয়

মুহাম্মাদ মুসলেহুদ্দীন বুখারী
হুরাইমালা ইসলামিক সেন্টার

ইসলামের বিভিন্ন মসলা-মাসায়েল নিয়ে ওলামাদের মাঝে মতানৈক্য পূর্ব যুগ থেকেই চলে আসছে এবং চলতে থাকবে। তারই একটি, বর্তমান সমাজে ফরয নামাযের পর ইমামের দুই হাত তুলে দুআ করা ও মুক্তাদীগণের 'আমীন-আমীন' বলার প্রচলিত রীতি অনেক জায়গায় এখনও চালু হয়ে আছে। যা আদৌ সহীহ সুন্নাহর মুতাবেক নয়। এটি একটি পূর্বপূরুষদের ভোলা-ভালা মানুষদের রীতি আর কিছু উলামাদের কোরআনের বহুবচন শব্দের ভুল ইস্তিদলাল ও হাদীস গ্রহণ-বর্জন নীতির পূর্ণ জ্ঞান না থাকায় কিছু দুর্বল হাদীসকে দুর্বল মনে না করে---তা প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করার ফল মাত্র।

মুসান্নাফে ইবনি আবী শাইবা থেকে উক্ত বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে, যা আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী সাহেব তোহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যাতে বলা হয়েছে যে, "যখন তিনি ﷺ সালাম ফিরলেন তখন ঘুরে বসলেন এবং দুই হাত তুলে দুআ করলেন।"

আল্লামা মুবারকপুরী একজন আমানতদার ন্যায়পরায়ণ মুহাদ্দিস বলেই তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, 'হাদীসটি এইভাবে কিছু উলামায়ে-কেরাম বর্ণনা করেছেন, কিন্তু উক্ত হাদীসের সনদ সম্পর্কে আমি অবগত হতে পারিনি, ফলে হাদীসটি সহীহ না যয়ীফ, তা আল্লাহই ভাল জানেন।'

এইরূপ আরো কিছু যয়ীফ (দুর্বল) হাদীসকে দলীল মনে করে, হাদীসের আসল রূপ না দেখেই কতিপয় আলেম ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ করা নিয়ে সমাজের সরল-মনা মানুষদের মাঝে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন, যা অতি দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। অথচ মুসান্নাফে ইবনি আবী শাইবা ও ইবনে হায্‌ম তাঁর 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে পূর্ণ সনদ সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, "যখন তিনি ﷺ সালাম ফিরলেন, তখন ঘুরে বসলেন।" 'দুই হাত তুলে দুআ করলেন' শব্দগুলি নেই।

আরো পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশীয় কিছু ওলামাদের সাথে তুলনা করতে গিয়ে বর্তমান যুগ-শ্রেষ্ঠ ও বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আলবানী

(রঃ)কে ইসলামে ফাটল ধরানোর মত ঘৃণিত অপবাদ দিতে কুণ্ঠিত হন নি। হায় আফশোস ! একজন বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিসকে না জেনে, না চিনে, তাঁর উপর এরূপ মন্তব্য করে তাঁর সম্মানে কুঠারাঘাত করা কি কোন ন্যায়পরায়ণ ও ইনসাফকারী মানুষের কর্ম। বিশেষ করে একজন সাধারণ আলেমের জন্য একজন বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিসের বিরুদ্ধে মুখ খোলাটাই অশোভনীয়। আর তাই যদি হয় তবে, বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদকারী মযহাবী ইমামদেরকে কি উপাধিতে ভূষিত করবেন।

হয়তো বলবেন, পূর্বযুগের মুহাদ্দিসগণ কি সনদ জানতেন না? আমরা বলব অবশ্যই জানতেন, আমরা তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করি, তাঁদের বিরুদ্ধে কোন কটুক্তি করি না। তবে জেনে রাখা দরকার যে, পূর্বের তাহকীকী অসায়িল ও বর্তমানের তাহকীকী অসায়িলে পার্থক্য আছে। হতে পারে যে, পূর্ব তাহকীকে যে ত্রুটি ধরা পড়েনি, বর্তমান তাহকীকে তা ধরা পড়েছে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত কোন উলামার মত বা তাঁর আমল, বা কোন উস্তাদকে কোন আমল করতে দেখাটা বা কিছু উলামাবৃন্দের নাম নিয়ে, তাঁদেরকে শরীয়তের দলীল মনে করা কোন হক্কানী আলেমের উচিত নয়, কারণ কোন আলেমের আমল শরীয়তের দলীল হতে পারে না। শরীয়তের একমাত্র দলীল হল কোরআন ও সহীহ সুন্নাহ। নবী ﷺ বলেন,

(تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ).

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে গেলাম, তোমরা যতদিন তা আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না, আর তা হল আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ।" *(মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক)*

এই হাদীসে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল যে, নবী ﷺ-এর মৃত্যুর সময় লক্ষাধিক জলীলুল ক্বদর সাহাবায়ে-কেরাম, দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী, কাতেবে অহী, এমনকি চার খলীফা জীবিত ছিলেন। কিন্তু নবী ﷺ বললেন না যে, "তোমাদের মাঝে আবু বকর, উমার ইত্যাদি জলীলুল ক্বদর সাহাবায়ে-কেরামগণ আছেন, তাঁদের কথাকে আঁকড়ে ধরবে। অথচ তাঁদের কথা শরীয়তের দলীল হতে পারে। আসলে নবী ﷺ উম্মতকে এমন একটি হিদায়াত দিয়ে গেছেন, যাতে নেই কোন জড়তা ও বিভ্রান্তির অবকাশ। সুতরাং ফরয নামাযের পর দুই হাত তুলে দুআ করার সহীহ হাদীস থাকলে আমরা তা মেনে নেব না কেন ? আমরা কি হাদীস মানি না ? এ ছাড়া যে সকল উলামাদেরকে **'দুআ কেন্দ্রবিন্দুয় সবার লক্ষ্য'** বইটিতে

দলীলরূপে ব্যবহার করা হয়েছে, বর্তমানে তাঁদের অনেকেই এই রেওয়াজী দুআর বিরোধিতা করছেন ও তা বিদআত বলছেন। যেমন আমতলা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শায়খুল হাদীস মাওলানা শওকাত আলী সাহেব পূর্বে বলতেন, 'দুআর পক্ষে অনেক দলীল আছে।' কিন্তু বর্তমানে তিনি হক উপলব্ধি করতে পেরে নিজেই বলছেন, 'ঈদের নামাযের পর ও ফরয নামাযের পর এইভাবে দুআ করাটা বিদআত বলাই উচিত।' তিনি এই মর্মে মুর্শিদাবাদ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি মাওলানা আনওয়ারুল হক সাহেবের সামনে স্বাক্ষরও করেছেন।

অনুরূপ শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুর রউফ শামীম (রঃ) সাহেবের লিখিত গ্রন্থ 'ফিকাহ মুহাম্মাদিয়া'কে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বে তিনি দুআ করার কথা লিখেছিলেন। কিন্তু পরে আপন ভুল বুঝতে পেরে তা থেকে রুজু করেছেন (সত্য সন্ধানী ও ন্যায়-পরায়ণ আলেমগণ এমনই হয়ে থাকেন, শুধু নিজের আত্মসম্মানের কথা ভাবেন না, তবেই তো একজন আলেম সমাজের জন্য উত্তম আদর্শ।) এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই প্রচলিত বিদআতের বিরোধিতা করে গেছেন।

আর কিছু উলামায়ে-কেরাম এখনও আছেন, যাঁরা হয়তো এই সত্যকে উপলব্ধি করার পরেও নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখতে ও 'সমাজ কি বলবে' এই আশংকায় সত্যটাকে প্রকাশ করতে পারছেন না। হয়তো ভাবছেন, এত দিন নিজে দুআ করে এসেছি, করতে বলেছি, প্রশ্নের জবাবে তাহক্বীক্ব ছাড়াই 'দুআ ভাল কাজ, অতএব করা চলবে' বলে এসেছি, এখন হঠাৎ করে এর উল্টো কিভাবে বলব?

'এক বিষয়ী যয়ীফ হাদীস ক্রমাগত বর্ণিত হতে থাকলে, তা যয়ীফ থাকে না, তা মুতাওয়াতির বা সহীহ হয়ে যায়!' কথাটি কোন মুহাদ্দিস বলেন নি। মুতাওয়াতির বা সহীহ নয়, যয়ীফ তো যয়ীফই। যয়ীফ সামান্য হলে, সে হাদীস 'হাসান' বা সহীহ লিগায়রিহ' হতে পারে, মুতাওয়াতির তো আদৌ নয়।

আর কোন কোন উলামার মতে যয়ীফ হাদীস ফাযায়েলে আমলে বর্ণনা করা যায়, এতেও সকলে একমত নন। তাছাড়া তা নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষ ঃ-

১ - হাদীস যেন খুব বেশি যয়ীফ না হয়।

২ - যে আমলের ফযীলত বর্ণনা করা হবে তার ভিত্তি শরীয়তে প্রমাণিত হতে হবে।

৩ -তার উপর আমলকারী বা তা বর্ণনা কারী যেন এ বিশ্বাস না রাখে যে এটা নবী ﷺ এর শুদ্ধ হাদীস। *(দেখুন মুস্তালাহুল হাদীস, শায়খ সালেহ বিন উসাইমীন)*

শা-রেহ বুখারী ইবনে হাজার আসক্বালানী (রঃ) আরো একটি শর্ত বর্ণনা করেছেন

তা হল---

৪ - তা যেন প্রচার না করা হয়।

সে যাই হোক, ফরয নামাযের পর দুআ বিদআত হলেও, দুআর দুয়ার তো আর বন্ধ নয়। তবে এ নিয়ে ঘরের দেওয়ালে আঘাত কেন?

প্রত্যেক মানুষের বই লেখার স্বাধীনতা আছে তাছাড়া কারো লিখিত গ্রন্থ দ্বারা সমাজ উপকৃত হলে তা লেখকের জন্যে মৃত্যর পরেও সাদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে ফল দেবে, ফলে প্রত্যেক লেখকের ভেবে-চিন্তে কলম ধরা উচিত। যাতে তার দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়, বিভ্রান্ত না হয়।

আর ইল্মী রদ করতে গিয়ে পরিবারগত হামলা তো জ্ঞানী মানুষরা করেন না।

ভাড়াটিয়া লেখক ! ভাড়াটিয়া লেখক কাকে বলে? হয়তো তারাই ভাড়াটিয়া লেখক, যারা লেখালেখির মাধ্যমে বই বিক্রি করে শুধু পার্থিব অর্থ উপার্জনের আশায় থাকেন। তবুও আমার মনে হয় কথাটি ভুল হবে। কারণ একজন লেখকেরও তো কিছু অধিকার আছে। আমার জানা মতে আমার শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেব লেখালেখির মাধ্যমে কোন অর্থ উপার্জন করেন না, বরং ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর লিখিত পঞ্চাশাধিক বই-পুস্তিকা ও তফসীর আহসানুল বায়ান দ্বারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাংলাভাষী লক্ষ লক্ষ মানুষ বিনা খরচেই উপকৃত হচ্ছেন। একজন ভাড়াটিয়া লেখক কোনদিন নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে এইভাবে বিনা মূল্যে আপন লিখিত গ্রন্থ ছেড়ে দিতে পারেন না। প্রিয় পাঠক আপনিও ইন্টারনেটের নিম্নোক্ত ঠিকানায় উক্ত তফসীর ও বই -পুস্তিকা দ্বারা উপকৃত হন।

www.abdulhamid-alfaidi-almadani.webs.com

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করার ও সৎ উদ্দেশ্যে লেখালেখি করার তওফীক্ব দান করেন আমীন।

এখনও মুনাজাত নিয়ে গোঁড়ামি?

মুহাঃ আব্দুল লতীফ মাদানী
আল-গাত ইসলামিক সেন্টার

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

দুআ হচ্ছে ইবাদত। আল্লাহর কাছে বান্দা তার জীবনের সকল প্রকার আশা-আকাংক্ষা ও চাওয়া-পাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে দুআ। আর এটি একটি ইবাদত যা সুন্নত পদ্ধতিতে করতে হবে। ফরয নামাযের সালাম ফিরার পর আল্লাহর রসূল ﷺ একাকী যিক্র ও দুআ পড়েছেন এবং আমাদেরকে এগুলি পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন ও তার ফযীলত বর্ণনা করেছেন। রসূলে হাবীব ﷺ-এর রেখে যাওয়া পদ্ধতি ছেড়ে মনগড়া নব আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে দুআ করলে তা কবুল হওয়ার বদলে গোনাহই হবে। আল্লাহ রসূল ﷺ নামাযের মধ্যেই দুআ করেছেন। মূলতঃ নামাযটাই মুমিনের শ্রেষ্ঠ দুআ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ} (٤٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। *(সূরা বাক্বারাহ ৪৫ আয়াত)*

তাকবীরে তাহরিমার পর থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত নামাযের এই নিরিবিলি সময়ে বান্দাহ তার দয়াময় প্রভুর সাথে মুনাজাত করে। সানা, সূরা ফাতেহা, রুকু, সাজদাহর মাঝখানে পঠিতব্য দুআগুলিও শ্রেষ্ঠতম দুআ। কুনূত পড়ার সময় ও নামাযে কুরআন পাঠের সময় রহমতের আয়াত পাঠকালে আল্লাহর করুণা চেয়ে এবং আযাবের আয়াত পাঠকালে আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ক'রে দুআ করা। এ ছাড়াও সহীহ হাদীসে আছে যে, 'সাজদাহর সময় বান্দাহ তার প্রভুর সন্নিকটে পৌঁছে যায়। তখন দুআ করলে দুআ কবূল হয়। (মুসলিম) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বেশী বেশী ক'রে দুআ করতেন। (মুসলিম) কিন্তু যখনই সালাম ফিরা হয়, তখনই এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

আল্লাহর রসূল ﷺ ও সাহাবাগণের যুগে ফরয নামাযের পর জামাআতবদ্ধভাবে হাত তুলে মুনাজাত করার প্রচলন ছিল না। ফরয নামাযের শেষে সালাম ফিরানোর পরে

ইমাম ও মুক্তাদী জামাআতবদ্ধভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দুআ পাঠ ও মুক্তদীগণের 'আমীন আমীন' বলার প্রচলিত প্রথাটি শরীয়তের মধ্যে একটি নতুন সংযোজন, যা সুস্পষ্ট বিদআত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম হতে এর সপক্ষে সহীহ কোন দলীল নেই।

অতএব নামাযের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দুআ করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আজও কাবা শরীফ ও মদীনা শরীফের মসজিদে নববী-সহ সারা সউদী আরবের কোন মসজিদেই উক্ত প্রথার কোন অস্তিত্ব নেই। এই বিদআতী প্রথার পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে চালু দেখতে পাওয়া যায়। সহীহ হাদীস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ও হক্ব-বিমুখ আলেম দ্বারাই ফরয সালাতের পর সমবেতভাবে হাত উঠিয়ে দুআ করার সুন্নত পরিপন্থী আমল চলে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। অথচ হক্বপন্থী উলামাগণের নিকট শরীয়তের সঠিক ফায়সালা অবগত হওয়ার পর তার দিকে ফিরে আসা এবং আমলে রূপ দেওয়া আত্মসমর্পণকারী মুসলিমের অবশ্যই ওয়াজেব।

ফরয নামাযের সালাম ফিরার পর প্রচলিত সম্মিলিত বিদআতী দুআর যারা বিরোধী তাদের অন্যতম হলেন, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রাক্তন মুফতী, আহলে হাদীসের মুকুটমণি শায়খুল হাদীস আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দিন নদীয়াভী (রঃ), বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রাক্তন সভাপতি ডক্টর আল্লামা আব্দুল বারী (রঃ), ডক্টর আসাদুল্লাহ আল-গালেব, শায়খ আব্দুল মাতীন সালাফী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের বর্তমান সভাপতি প্রফেসর এ.কে শামসুল আলম, ডঃ হাফেয মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী, ডক্টর মুফাযযল হুসাইন মাদানী, শায়খ খোরশেদ আলম মাদানী প্রমুখ। তাছাড়াও সউদী আরবের মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রি অর্জনকারী মাশায়েখগণও প্রচলিত এই বিদআতী প্রথার বিরুদ্ধে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত হৃদয় নিয়ে প্রচলিত সুন্নাত-বিরোধী দুআর বিপক্ষে ও সুন্নাতে রাসূল প্রতিষ্ঠা এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শির্ক-বিদআত উৎখাতের লক্ষ্যে দলীল প্রমাণাদি-সহ লেখনী, বক্তব্য, আমল এবং প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন ক'রে যাচ্ছেন। সাউদী আরব ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আল-মাজমাআহ ইসলামিক সেন্টারের সুযোগ্য অনুবাদক ও দাঈ পঞ্চাশেরও অধিক মূল্যবান বইয়ের লেখক ও সুবক্তা শায়খ আব্দুল হামীদ আল ফাইযী, আল-মাদানী সাহেবও তাঁদেরই পথের একজন পথিক। মহান আল্লাহ উনাকে হায়াতে তাইয়্যেবাহ দান করুন এবং আরো বেশী-বেশী হক্ব কথা বলার ও প্রচার-প্রসারের তাওফীক দান করুন এবং দু'জাহানে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন!

অতীব দুঃখের কথা এই যে, রসূলে আকরাম ﷺ এর সহীহ সুন্নাহ প্রচার-প্রসার ও জীবিত করার দরুন সম্মানিত শায়খ আব্দুল হামীদ সাহেবের ভারতে বিদআতী শ্রেণীর তথাকথিত কিছু সংখ্যক মৌলবী সাহেবরা তাঁর বিরোধিতা ক'রে যাচ্ছেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর আঘাত হানছেন; যা কোন মু'মিনের কার্য নয়।

জানলাম, তাঁরা নাকি ফাযায়েলে আমালিয়াতে যয়ীফ হাদীস মানেন!

তাঁরা বিদআতে হাসানাহ মানেন!

তাঁরা তাঁদের বুযুর্গদেরকে তাঁদের দলীল মনে করেন!

তাঁরা আল্লামা আলবানীকে না চিনেই তাঁর সমালোচনা করেন!

তাঁরা সাউদী আরবের আলেম-উলামারও কোন মূল্য দেন না! সাউদী আরবে যেটা বিদআত, তাঁরা সেটাকে সুন্নত বলেন এবং সাউদী আরবে যেটা সুন্নত, সেটাকে তাঁরা বিদআত বলেন!

সুতরাং এমন মৌলবী সাহেবদের সঙ্গে তর্কে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁদের মতও ভিন্ন পথও ভিন্ন।

আমি ঐ মৌলভী সাহেবদের তীব্র নিন্দা করছি। সাথে সাথে তাঁদেরকে অপপ্রচার হতে বিরত থেকে হক্ব ও সত্য পথ গ্রহণ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ এরূপ বিদআতী আলেমদেরকে সহীহ সুন্নাহ বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

নিজেকে বাঁচাতে পরকে কামড়

শায়খ শামসুয যুহা রহমানী

ফরেনার গাইডেন্স্ সেন্টার, তুমাইর

দ্বীন-ইসলামের সংরক্ষণের দায়-দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং সেই হেতু তিনি নবীদের ওয়ারিস হিসাবে উলামায়ে কেরামদেরকে নির্বাচিত করেছেন। আবার উলামাদের মধ্য থেকে বাছাই করেছেন এক শ্রেণীর ন্যায়পন্থী ও জ্ঞানে সুগভীর উলামাগণকে। নিশ্চয় সকল আলেম বা পন্ডিতগণ জ্ঞানে সমান নন। এই জন্য আল্লাহ পাক সুগভীর জ্ঞানের আলেমদেরকে একটি ভিন্ন লেবেল দিয়ে আখ্যায়িত ক'রে বলেছেন, والراسخون في العلم অর্থাৎ, জ্ঞানে যারা সুগভীর ও পরিপক্ব। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, আলেমদের মধ্যে এমনও আছেন, যাঁরা জ্ঞানে পরিপক্ব ও সুদৃঢ় নন।

নবী ﷺ বলেছেন, ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين অর্থাৎ, আল্লাহ যার সাথে মঙ্গল চান তাকেই দ্বীন-ধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান দান ক'রে থাকেন। এখানে 'আদ-দীন' এর অর্থ পূর্ণ দ্বীন বা ধর্ম। উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ণ দ্বীনের ইল্ম আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই দেন। তার মানে হল ধর্ম-জ্ঞান আল্লাহ সবাইকে সমান দেন না। আর এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ আল্লাহরই বাণী, وفوق كل ذي علم عليم অর্থাৎ, প্রত্যেক জ্ঞানী উপরে রয়েছে অধিকতর জ্ঞানী। *(ইউসুফঃ ৭৬)* তাহলে এটাই সাব্যস্ত ও কুরআন-হাদীস সম্মত যে, সকল আলেমগণ সমান নন। সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু ক'রে অদ্যাবধি উলামায়ে কেরামদের তালিকা ও সূচীপত্রও এ কথারই প্রমাণ করে, যার সাক্ষ্য ইসলামী ইতিহাস। কখনই ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ সমান হিসাবে মানব সমাজে বিবেচিত হননি। বরং তাঁদের মাঝে রয়েছে নানা শ্রেণীর তারতম্য।

আম-পাবলিকের প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায় 'আলেম' বা 'মাওলানা' শব্দের উপাধি পেলেই যে সবাই ইমাম বুখারী ও মুসলিম এবং ইমাম ইবনে তায়মিয়্যাহ, ইবনুল কায়্যেম-এর মত আলেম বলে মানা যাবে, তা কখনই নয়। কারণ, আমাদের দেশস্থ মক্তব-মাদ্রাসার সকল মৌলভী ও মুদার্রিসগণই আলেম বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন। শুধু মাদ্রাসায় পড়া-শোনা করলেই যে, যুগরত্ন শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ও শায়খ আলবানীর মত দাবীদার হওয়া যায়, তা যায় না। 'দাস্তারবন্দী' ক'রে সাদা বা সবুজ রংবিশিষ্ট পাগড়ী অর্জন করেই নিজেকে শায়খ ইবনে উসাইমীন ও ইবনে বায্ ভাবা যায় না, উচিতও না। পাবলিকে মৌলবী-মাওলানা বললই বা অথবা সাধারণ মানুষের মধ্যে একটু জানা-শোনা লোক বলে মানলই বা তাই বলে কি সবাই শায়খ আলবানী প্রমুখের মত হয় নাকি? কখনো হয়েছে না হবে! এর জন্য হওয়া চাই তাঁদের মত অগাধ জ্ঞান ও পান্ডিত্যের মালিক। ডালে লবণ পরিমাণ বিদ্যা নিয়ে লাফা-কুদা ও পুঁটি মাছের ন্যায় জল ঘোলা করা তো আর আমাদের মত চুনোপুঁটি মৌলভীদের উচিত নয়।

বলা বাহুল্য, তাঁদেরই ইল্মী খেদমতের উপর আমাদের নাচন-কুদন। তাই নিয়েই আমরা কুরআন-হাদীসকে সঠিকরূপে বুঝার উন্মুক্ত পথ পেয়েছি। তাঁদেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বই-পুস্তকের উপর নির্ভর ক'রে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও লেখনী। আর এ কথা বর্তমান যুগের কোন আলেমই অস্বীকার করতে পারেন না; যদি তিনি বিকৃত ধ্যান-ধারণার উপর না থাকেন বা হিংসুক-বিদ্বেষী ও পরশ্রীকাতর না হন।

আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আলেম সমাজকে চার ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(১) পূর্বে উল্লিখিত জন-স্বীকৃত খ্যাতনামা উলামাগণ।

(২) তাঁদের অনুসারী ও সাম্প্রতিক কালের গণ্যমান্য উলামায়ে কেরামদের বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা লেখনীর উপর নির্ভর ক'রে স্বীয় জ্ঞানে সুদৃঢ় ও পরিপক্ক।

(৩) যাঁরা বিভিন্ন ধরণের দ্বীনী সেবা ও স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত। যেমন, আমাদের দেশ-ঘরের স্কুল-মাদ্রাসা সমাজের আলেমগণ। তবে ইনাদের মধ্যে যে শ্রেণীবিন্যাস অবশ্যই আছে--তা অনস্বীকার্য।

(৪) মক্তব-মসজিদের আলেমগণ, যাঁরা শিশু ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা সহ মসজিদের আযান-ইমামতি প্রভৃতি দায়িত্বে নিয়োজিত।

এখন কথা হল যে, সকল শ্রেণীর আলেমরা নিজেকে আলেম ভাবলেও বা আখ্যায়িত হলেও সমজ্ঞানের অধিকারী তো সবাই নিশ্চয় নয়। নয় নিশ্চয় সকলেই আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ ও শায়খ আলবানী এবং ইমাম বুখারী ও মুসলিম। সুতরাং সকল শ্রেণীকে একাপরের বড়ত্ব ও ছোটত্ব মেনে নিতেই হবে।

আমার স্বীয় কর্ণশ্রুত একটি ঘটনা যে, কোন মাদ্রাসায় আমার শিক্ষক থাকাকালীন, কোন শিক্ষক প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী ছাত্রদেরকে কোন বিষয় পড়াতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ তাদের সম্মুখে একটি প্রশ্নের উত্থাপন ক'রে বললেন, 'যে সঠিক উত্তর দিতে পারবে, তাকে একটি টাকা প্রাইজ দেওয়া হবে।' অল্প হলেও প্রাইজ হিসাবে তা অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা সবার মনে একই রকম।

যাই হোক প্রশ্নটি ছিল যে الحمد কোন্ সীগা? প্রশ্নের উত্তর কেউ কিছু দিল, অন্য কেউ অন্য কিছু দিল। কিন্তু উত্তর কারো সঠিক হলো না। শেষে হঠাৎ এক ছাত্র উত্তর দিতে গিয়ে বলল, 'মাওলানা সাহেব! এটা واحد متكلم এর সীগা।' আর কোথায় যাবে? শাবাসির উপর শাবাসি এবং সাথে সাথে ওয়াদাকৃত পুরস্কার সেই ছাত্রের হাতে ধরিয়ে দিয়ে অন্যান্য ছাত্রদেরকে যা-তাইভাবে বকুনি আরম্ভ করলেন!

এবার আমার কথা হল যে, যদি এই ধরণের আলেমকে কোন শ্রেণীতেই না রাখা হয়, তাহলে কি তা ভুল হবে? মনে হয় তা হবে না। আর শুধু এটাই না, এই ধরণের কত যে 'আলেম' শব্দের বাহক আছেন তা আল্লাহই ভাল জানেন। এ সব কুলের কথা খুলে বলবেন কাকে বলুন? আবার এ তো যা আছে তা আছে, এর চাইতেও বড় আশ্চর্য কথা হল এই যে, এই ধরণের চৌথা মার্কা গ্রুপের আলেমদের সামনে যখনই কোন ফতোয়া বা মসলায় আল্লামা আলবানী, শায়খ ইবনে উসাইমীন ও

ইবনে বাযের মত আলেমদের মতামতের উদ্ধৃতি পেশ করা হয় বা তাঁদের লেখনী বই-পুস্তকের উল্লেখ করা হয়, তখনই মুখের ফাঁড় বড় করে উচ্চ স্বরে বলে ওঠে, 'আরে এগুলো আবার কি? ওরাও আলেম আমরাও আলেম!' অনেকে ভাল শিক্ষকদের প্রতি কটুক্তি ক'রে বলে, 'ওরাও বুখারী পড়ে মাওলানা হয়েছে, আমরাও বুখারী পড়ে মাওলানা হয়েছি।' বলুন তো! কি বলবেন এদেরকে? এরা আলেম, নাকি জাহেল, নাকি হিংসুক ও বিদ্বেষী?

সীমা ছাড়িয়ে গেছে হিংসা ও বিদ্বেষের। সাম্প্রতিক কিছু আলেমগণ সমাজের কাছে বড় ও গৃহীত হওয়ার মানসে, কিছু মাসলা-মাসায়েল নিয়ে বিশৃঙ্খলা বিস্তার ক'রে বিরোধী জনপ্রিয় উলামাদেরকে সমাজের কাছে দুষ্ট, কলঙ্কিত ও বদনাম করতে ময়দানে নেমে পড়েছেন। বিশেষ ক'রে সৌদিয়াতে চাকরীরত প্রবাসী আলেমদের ক্ষেত্রে বহু শিক্ষিত মানুষের মন-মানসিকতা এ রকম তৈরী হয়েছে। 'এরা সৌদিয়ার দালাল বা চামচা, এরা ওদের রিয়াল খেয়ে ওদের মত বলে' ইত্যাদি। অথচ কুরআন-হাদীস কারো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। তাছাড়া সৌদী আলেমরাও বাতিলপন্থী নন।

বহু আলেম এমন আছেন, যাঁরা আকীদাগত ও মাযহাবগত ব্যাপারে নিজেদেরকে সঠিকপন্থী ও সৌদী উলামাদেরকে বিপথগামী ভাবেন! সৌদী আরব কাকে কোথা স্থান দেয়, আশ্রয় দেয় বা কি করে, আর কি করে না, এহেন কিছু রাজনৈতিক বিষয় যাতে ভুল ও ঠিক উভয়ের অবকাশ আছে---এমন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে বহু সাধারণ ও অসাধারণ এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকেরা তাঁদের বহু ধর্মীয় বিষয়কেও প্রত্যাখ্যান করার দুঃসাহসিকতা করে। অথচ কুরআন-হাদীস নিজের জায়গায় অটল যা কারো পক্ষপাতিত্ব করে না।

বলা বাহুল্য, এ সমস্ত উক্তির উৎস মানুষের দৃষ্টিমনে শয়তান অবিরত নানান উস্কানি দিতে আছে। এসব নীতি ও আচরণ যে শুধুমাত্র সংকীর্ণমনা, হিংসুক, বিদ্বেষী ও পরশ্রীকাতর মানুষেরই হতে পারে--তা সহজেই অনুমেয়। এই প্রকৃতির লোকদের অন্তরে বড়র বড়ত্ব ও যোগ্যের যোগ্যতা স্থান পায় না। সুনামের ইস্যু খাড়া হলেই লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, 'ব্যাপারটা তো ঠিকই; কিন্তু এ যে দেখছি সব পাল্টে দিল।' ইত্যাদি। এই তো প্রবৃত্তি, প্রকৃতি ও মানুষের মানসিকতা। সত্যি বলতে গেলে এ ব্যাধির ব্যাধিগ্রস্ত কে? সেই চৌথা মার্কা আলেমরাই বেশির ভাগ।

নবী ﷺ আমাদেরকে প্রত্যেক মানুষকে তার যথার্থ মর্যাদা দিতে আদেশ

করেছেন। কিন্তু সুধীমণ্ডলী! যদি আপনি আপনার প্রকৃতিতে বাধ্য হয়ে বড়র বড়ত্ব না-ই মানতে পারেন, তাহলে অন্ততঃ নিন্দা-মন্দ অপপ্রচার ও কুৎসা না রটিয়ে নীরবতা অবলম্বন করতে প্রয়াসী হন। এতেও মুক্তির দিক লুক্কায়িত আছে। নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

পক্ষান্তরে হকপন্থী বিদ্যানদের প্রতি কটুক্তি করায় ছোট মুখে বড় কথা বলায় ও তাঁদের নিন্দা-মন্দ করায় ওঁদের কি উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে? এতে তাঁদের ইল্‌মের পরিমাণ কি কমিয়ে দিয়েছে? আর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কি এমন তাঁদের মানহানি করেছেন? এর দ্বারা সমাজকে কতখানি শিক্ষা দিতে পেরেছেন? কি এমন পথভ্রষ্ট ও পাপের অন্ধকারাগারে বন্দী মানুষকে হেদায়াতের পথে আনীত করেছেন? একটু ভাবা উচিত যে, প্রত্যেক কাজের পিছনে একটি না একটি সৎ উদ্দেশ্য থাকা উচিত। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য যদি অপরকে ছোট ক'রে শুধু জনপ্রিয়তা ও সমাজে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনই হয়, তাহলে তাঁদের সতর্ক হওয়া উচিত।

মহা পন্ডিতগণ নিয়ত ও কর্মগত দিক থেকে আলেমগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা ঃ-

١. طلاب الكراسي في قصور الحكام

٢. طلاب الكراسي في قلوب العوام

٣. طلاب الكراسي في دار السلام

প্রথম ঃ সরকার মহলে পদান্বেষী আলেমগণ।

দ্বিতীয় ঃ জনমানসে যশের আসনকামী উলামাগণ।

তৃতীয় ঃ শান্তিনিকেতন (জান্নাতে) উপবেশনের অভিলাষী আলেমগণ। এবারে তাঁরা চিন্তা ক'রে দেখুন যে, কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে চান তাঁরা?

সুধীমন্ডলী সাবধান! জন সমাজে কোন আলেমের নিন্দা-মন্দ ক'রে তাঁর অবমাননা করা সমাজের কাছে তাকে হেয় প্রতিপন্ন ও ছোট করা বা তাঁর লিখিত বই-পুস্তকের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করা আল্লাহর পথে ও সত্যান্বেষণের পথে বাধা সৃষ্টি করার শামিল এবং এতে শরীয়তের পূর্ণ অবমাননা করা হয়। ভেবে দেখুন এই আচরণ আপনার মধ্যে থাকলে আপনি আল্লাহর সামনে কৈফিয়ত কি দেবেন? এক শ্রেণীর মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّـــهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ} (٤٧) سورة الأنفال

অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা গর্বভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজ গৃহ হতে বের হয়েছিল এবং লোককে আল্লাহর পথ হতে বাধা দান করছিল। তাদের সকল কীর্তিকলাপই আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে। *(সূরা আনফাল ৪৭ আয়াত)*

হিংসা বিদ্বেষ ও অহমিকার জালে জর্জড়িত হয়ে এবং জনসমাজে উচ্চাসন ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের লালসায় হক্কানী আলেমদেরকে হেয় প্রতিপন্ন ও ছোট করা ন্যায়পরায়ণ জ্ঞানীদের নীতি নয়। আর কে বলেছে যে, কোন আলেমের মর্যাদা হ্রাস করার হীনতার মধ্যেই বড়ত্ব অর্জনের স্বার্থ নিহিত আছে? একজন আরবী কবি বলেছেন,

وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى ... يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل

অর্থাৎ, মানীর মানহানি ক'রে বা বড়দের মর্যাদা হ্রাস ক'রে স্বীয় দোষ-ত্রুটি প্রতিহত করা, এটা মানুষের সুবিচার নয়।

কবি বলেন,

'স্বীয় দোষ ঢাকিবারে পরে ছোট করা,
ইনসাফ নহে ইহা ওগো মানুষেরা!'

সুবিচার নয় নিজের ময়দান ছেড়ে অন্য ময়দানের কথা বলা। ইনসাফ নয় ছোট মুখে বড় কথা বলা।

'ছোট মুখে বড় কথা নয় কভু ইহা যথা,
তবে কেন ওহে ভ্রাতা বলে উহা দাও ব্যথা
এই কি তোমার আচরণ?'

সুতরাং সুধী সাবধান! যে কোন কথা বলার পূর্বে যে কোন নীতি ও আচরণ অবলম্বন করার পূর্বে এবং যে কোন কাজে পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তার পরিণাম ও যথা ও অযথার ব্যাপারে ভেবে দেখে নিন। যাতে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত না হন এবং অজ্ঞতাবশতঃ মুমিন ভায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হন।

আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}

যারা মুমিন নর ও নারীদেরকে বিনা দোষে অহেতুক দুঃখকষ্ট দেয়, নিশ্চয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

পরিশেষে দুআ করি যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকল মুমিন-মুসলিমদেরকে স্বচ্ছ, পবিত্র ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দান কর এবং যাবতীয় শয়তানী সংশয় ও কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখ। আমীন!

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ফতহুল বারী থেকে ফতহুল বাড়ি কেন?

ক্বারী হাবীবুর রহমান ফাইযী
ফরেনার গাইডেন্স্ সেন্টার, আল-মাজমাআহ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم و بعد:

প্রিয় পাঠকগণ!

আপনারা শায়খ আব্দুল হামীদ মাদানীর চাচা-শ্বশুরের লেখা 'দুআ কেন্দ্রবিন্দুয় সবার লক্ষ্য' পুস্তিকাটি সম্ভবতঃ পড়েছেন। জানি না আপনাদেরকে কেমন লেগেছে। আমরা বলব যে, ফরয নামায বাদে হাত তুলে জামাআতবদ্ধ ভাবে দুআ করার পাক্কা দলীল কোথাও নেই; বরং যতগুলি দুআর সপক্ষে দলীল এসেছে তা সবই কাঁচা। দুআ না করারই সপক্ষে অধিকাংশ প্রমাণ আছে। সে কথা মৌঃ আঃ হামীদ মাদানী সাহেব স্বীয় পুস্তক 'স্বালাতে মুবাশ্শির'-এ তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে বড় বড় আলেম ও মুহাদ্দিসগণেরও বহু ফতোয়া বিদ্যমান রয়েছে। গত সফরে উক্ত দুআর ব্যাপারে প্রত্যেক আহলে হাদীস গ্রামে পরিবর্তনও আমার পরিলক্ষিত হয়েছে। অধিকাংশ হক সন্ধানী যুবকরা হকটাকে মেনে নিয়েছেন ও নিচ্ছেন।

বর্তমানে হক্কানী আলেম জনাব মৌঃ আব্দুল্লাহ সালাফী সাহেব ফরয নামাযের পর জামাআতবদ্ধ ভাবে দুআ না করার সপক্ষে অকাট্য প্রমাণসহ একটি জবাবী বই লিখেছেন। সেই বইটি বের হওয়ার পর পরই মাদানী সাহেবের চাচা-শ্বশুর তাঁর (মাদানী সাহেবের) শানে কিছু কথা বাড়াবাড়ি করে লিখে পারিবারিক খোঁটা দিয়ে

অসম্মান করেছেন। আমরা মনে করি, বংশ ও পরিবার নিয়ে কাদা-ছুড়াছুড়ি করা আসলেই ঠিক হয়নি। বরং এগুলি গীবত ও তোহমতের পর্যায়ভুক্ত। এ ব্যাপারে পাঁরুই, ইলামবাজার, বর্ধমান ও হুগলী এলাকা থেকে টেলিফোনের পর টেলিফোন আসতেই থাকে। আর সকলেই আশ্চর্য হয়ে চাচারই নিন্দা করেন। পুস্তকে মূলে (ফরয নামাযের পর হাত তুলে জামাতী দুআ নিয়ে) ইলমী তর্কবিতর্ক করা হয়েছে; কিন্তু চাচাজান রাগে তাঁর পরিবার ও বংশে খোঁটা দিয়ে অবাস্তব কিছু কথা লিখে ফেলেছেন। বংশটি চাচাজানেরও তো বটে, তিনিও তো সেই বংশের একজন।! অবশ্যই এমনটি করা ভুল হয়েছে। বরং চাচাজানকে ভাতীজার দ্বীনী লেখা-লেখি নিয়ে গর্ব করা উচিত ছিল যে, তাঁদেরই বংশে একজন হক্কানী আলেমকে বর্তমান কুসংস্কারময় পরিস্থিতিতে আল্লাহ জামাইরূপে দান করেছেন।

তাই বলি, পরিবার ও বংশ নিয়ে কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি আচরণটি একেবারে ভুল হয়েছে। কারণ, মাদানী সাহেবের শ্বশুরের বংশ মানে লেখকেরও বংশ। নিজের বংশের খোঁটা দেওয়া ভুল হবে না কি? তাই আমি বলি আগামীতে এগুলি খেয়াল রাখা উচিত। এতে লেখকেরও অসম্মান হচ্ছে বলে দুটি কথা লিখতে বাধ্য হলাম।

মহান আল্লাহ বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا)

অর্থাৎ, "হে মুমেনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।" *(সূরা আহযাব ৭০ নং আয়াত)*

এই আয়াতে আল্লাহ পাক দুটি কথা উল্লেখ করেছেন,

প্রথমতঃ আল্লাহকে ভয় কর 'অর্থাৎ মনে আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন কর, আত্মসংযমী হও।

দ্বিতীয়তঃ সত্য, সঠিক কথা বলা এবং কথার মাধ্যমে বিনা অপরাধে কাউকে কষ্ট না দেওয়া। এই জন্যই মহান আল্লাহ এর পূর্বের আয়াতে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا} (٦٩) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে ঈমানদাররা! মূসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়ো না; ওরা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন। আর আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান। (সূরা আহযাব ৬৯ আয়াত)

'ফরয নামাযের পর জামাতী দুআ'র ব্যাপারে আমরা বহু সংখ্যক আলেমগণকে দেখেছি যে, তাঁরা সত্যকে মেনে নিয়ে তাতে দুআ না করারই অভিমত পেশ করেছেন। শায়খুল হাদীস মৌলানা শামীম সাহেবই প্রথম দিকে এই দুআর সপক্ষে ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তা রুজু ক'রে নিয়েছেন তা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা। এটা অবাক লাগে যে, তাঁর রুজু করার পরও দুআর ব্যাপারে তাঁর গ্রন্থ 'ফিকহ্ মুহাম্মাদিয়া'কে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করে লেখক বলতে চেয়েছেন যে, তিনি দুআর সপক্ষে ছিলেন! অথচ তিনি তো হকটাকে মেনে নিয়েছিলেন। অতএব তাঁর হাওয়ালা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

হাফেয শায়খ আইনুল বারী সাহেবও জামাআতী দুআ ছাড়তে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'অতএব যারা কোরআন ও সহী হাদীসের নির্ভেজাল সত্যের অনুসারী সেই আহলে হাদীসদের উচিত পাঁচঅক্ত জামাআতের পর জামাআত সহকারে দুআ না করা এবং যারা উক্তরূপী দুআয় অভ্যস্ত তারা একেবারে না পারলে ধীরে ধীরে এক অক্তে দু অক্তে জামাআত সহকারে দুআ ত্যাগ করার অভ্যাস করুন এবং পরিশেষে পাঁচঅক্তেই ছেড়ে দিন।' *(সলাতে মুস্তফা ২/৬৩)*

অথচ প্রথম খণ্ডকে হাওয়ালারূপে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে অনেকের ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, বাংলার উক্ত দু'জন বড় বড় আলেমই জামাআতী দুআর পক্ষপাতী ছিলেন। অথচ তা নয়।

বলার কথা যে, জ্ঞানী-গুণীরা, সত্য সন্ধানীরা অজান্তে কখনো সহীহ ও সঠিককে ত্যাগ করেন, অতঃপর সত্যকে যখনই উপলব্ধি করেন, তখনই খোলা মনে বিনা দ্বিধায় মেনে নেন। আর এটাই বিশেষ ক'রে আলেম সমাজে হওয়া উচিত। তবেই তো জনসাধারণ হককে হক বলে মেনে নিতে তৎপর হবে।

লেখক (মৌঃ আঃ হামীদ মাদানী সাহেব) তাঁর পুস্তকে দুআর ব্যাপারে সত্য ও সহীহ অভিমতটাকেই তুলে ধরেছেন। তাতে তাঁর দোষ কোথায়? আর জবাবী বই তো উনি লেখেননি। 'দুআ কেন্দ্রবিন্দুয় সবারই লক্ষ্য' পুস্তিকাটিতে লেখক তাঁর ভাতিজা (মাদানী সাহেবের) ব্যাপারে কিছু বাড়াবাড়ি ক'রে অবাস্তব কথা লিখে ফেলেছেন। তাতে তাঁর মনে কষ্ট হয়েছে, তা আমরা জানি। মুসলিম ভাইকে বিনা দোষে কষ্ট দেওয়া আচরণটি লেখকের ভাল হয়নি। কারণ, আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে ইরশাদ করেন,

{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}

অর্থ, "যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা

অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।" *(সূরা আহ্‌যাব আয়াত নং ৫৮)*

সত্য নিয়ে বিদ্বেষ করা উচিত মনে করি না। কারণ, যে ব্যক্তি হিংসার ময়দানে নামবে সে দিশাহারা হয়ে মনে যা আসবে, তাই বলতে বা লিখতে লাগবে। তখন সে হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে না। এটা একেবারে বাস্তব কথা, যা আমরা বহু বিষয়ে প্রত্যক্ষ করে আসছি। এ জন্যই তো আল্লাহ পাক বলেছেন,

{وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}

"আর কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনোও ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর, এটাই আল্লাহ-ভীতির অধিক নিকটবর্তী।" *(সূরা মাইদাহ ৮ আয়াত)*

আমি বলব যে, দ্বীনী লেখা-লেখি নিয়ে রেষারেষি না হওয়া উচিত বিশেষ ক'রে আলেমদের মাঝে। কারণ, এতে সমাজের লোকেরা দিশাহারা হয়ে পড়ে যে, আমরা কোন্‌টা মানব আর কোন্‌টা ছাড়ব। অতএব হকটাকে সব সময় প্রচার করা ও মেনে নেওয়াই সকলের কর্তব্য।

আমি আশা রাখি, একদিন না একদিন 'দুআ কেন্দ্রবিন্দুয় সবারই লক্ষ্য'-এর লেখকও সত্যকে গ্রহণ ক'রে নেবেন ইন শা-আল্লাহ।

হক বলনে-ওলাদের উপর কালে কালে যুগে যুগে মসীবতের ঝড় বয়েছে ও বইতে থাকবে এটা স্বাভাবিক কথা। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা যে, তিনি যেন সত্য সন্ধানীদেরকে আগত মসীবতের উপর ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দান করেন। আর সকলকে সত্যকে হক বলে মেনে নেওয়া, অসত্য ও সন্দেহজনক বিষয়কে বর্জন করার সুমতি দান করেন। আমীন!

আর্তি ও আর্জি

আব্দুল হামীদ মাদানী

ঠিকই বলেছ, ওরা মানবে না। মানবেই বা কেন? যাদের মনে বড়ত্ব থাকে, তারা ছোটদের নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করবে কেন? এটা প্রেস্টিজের ব্যাপার নয়?

যাদের মনে 'হাম চুনী দিগার নিস্ত' থাকে, তারা হক গ্রহণ করবে কেন?

যাদের মনে অহংকার থাকে, তারা অপরকে তুচ্ছ ভাববে বৈকি?

তাদের গুণই তো হল, 'বাত্বরুল হাক্কি ও গামত্বুন নাস।'

আমি কে? আমাকে আবার ঘৃণা করবে না? তুচ্ছ জানবে না?

যে আমাকে ন্যাংটা অবস্থায় দেখেছে, সে কি আমাকে ছোট জানবে না?

যে মসজিদের দরজায় উস্কখুস্ক বেশে আমার উপোস-চেহারা দেখেছে, সে কি আমাকে তুচ্ছ ভাববে না?

অভাবের তাড়নায় যে আমাকে অসহায় নাজেহাল দেখেছে, সে কি আমাকে নীচ ভাববে না?

যে আমার গরীব আব্বাকে পরের কর্মরত অবস্থায় ঘর্মসিক্ত দেখেছে, সে কি আমাকে ঘৃণ্য ভাববে না?

যে আমার অশিক্ষিত গরীব মা-বাপকে দুর্বলরূপে দেখেছে, সে শিক্ষিত কি আমাকে দুর্বল জানবে না?

যে মূসার মত আমার ব্যাপারে ভুলক্রমে শত্রুপক্ষের মানুষ খুন করতে শুনেছে, সে ফিরআউন কি আমাকে অহংকারের দাপট দেখাবে না?

যার স্বার্থে আমি আঘাত হেনেছি, সে কি আমার সাদা কাপড়ে দাগ লাগাবে না?

যার প্রেম-আহবানে আমি সাড়া দিইনি, সে কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে কারাদণ্ড দেবে না?

কেউ আমার কবিত্বের কথা অস্বীকার করতে না পারলে, আমার চরিত্রহীনতার কথা বলতে পারে!

কেউ আমার লেখার কথা অস্বীকার না করতে পারলেও, আমাকে 'ভাড়াটিয়া লেখক' বলতে পারে!

কেউ আমার দানশীলতার কথা অস্বীকার করতে না পেরে 'রিয়াকার' বা 'সূদের

টাকা দিচ্ছে' বলতে পারে!

আমার হক কথাকে কেউ 'পাগলের প্রলাপ' বলতে পারে!

জবাবের বদলে জবাব খুঁজে না পেয়ে কেউ গালি দিতে পারে। দোষ খুঁজে না পেয়ে কেউ দোষ সৃষ্টি ক'রে অপমানিত করতে পারে। দলীলের গোলা-গুলির লড়াইয়ে হেরে গিয়ে গালা-গালি ক'রে গায়ের ঝাল মিটাতে পারে। কিন্তু সে গালিতে আমাদের লাভ আছে।

'গোলা-গুলি নাই, গালা-গালি আছে, তাই দিয়ে তারা লড়ে,
বোঝে নাক' থুথু উপরে ছুঁড়িলে আপনারি মুখে পড়ে!
আমরা দেখেছি, যত গালি ওরা ছুঁড়িয়া মেরেছে গায়ে,
ফুল হ'য়ে সব ফুটিয়া উঠিয়া ঝরিয়াছে তব পায়ে!'

অপমানের ছুঁড়া জুতো সযত্নে রেখে নেব, হয়তো বা তা কোনদিন কোন সংরক্ষণশালায় স্থান পাবে।

ধৈর্য ধারণ করার কথা বলছ ভাই! হ্যাঁ, ধৈর্যই তো ধরে আছি। নচেৎ দুশমনের মুখোশ আমিও খুলতে পারি। আর তাতে আমার নিজের মুখে থুথুও পড়বে না।

ঠিকই বলেছ, 'তুমি অধম বলিয়া কি আমি উত্তম হইব না?' উত্তম তো হতেই হবে। উত্তম মানুষের গুণই হল ধৈর্যশীলতা, সহনশীলতা, সত্য গ্রহণ করা। তোমার-আমার উস্তাযে মুহতারাম শায়খুল হাদীস মওলানা আব্দুর রঊফ শামীম সাহেব সেই রকমই একটি মানুষ ছিলেন। তাঁর আদর্শও আমাদের অনুসরণীয়।

সুতরাং আমি হাবীলের মত বলি,

{لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّـــهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} (٢٨) سورة المائدة

অর্থাৎ, আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি আমার প্রতি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার প্রতি হাত তুলব না, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালককে ভয় করি। *(সূরা মাইদাহ ২৮ আয়াত)*

ইয়াক্বূব ﷵ ও মা জননী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র মত বলি,

{فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} (١٨) سورة يوسف

অর্থাৎ, সুতরাং আমার পক্ষে পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।' *(সূরা ইউসুফ ১৮ আয়াত)*

জাবের ﷺ-কে দেওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ উপদেশ পালন করি, যাতে তিনি বলেছিলেন, "তুমি কাউকে কখনো গালি-গালাজ করবে না।....অহংকার প্রদর্শন করবে না। কারণ, নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারকে পছন্দ করেন না। যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় অথবা এমন দোষ ধরে তোমাকে লজ্জা দেয় যা তোমার মধ্যে বিদ্যমান আছে বলে জানে, তাহলে তুমি তার এমন দোষ ধরে তাকে লজ্জা দিয়ো না, যা তার মধ্যে বিদ্যমান আছে বলে জানো। যেহেতু তার সুফল তুমি পাবে, আর কুফল তার উপরই বর্তাবে (তোমার উপর নয়)।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৭০নং)*

কিন্তু এতেও দুশমনরা আত্মশ্লাঘার গন্ধ পাবে। কারণ, দেখতি লারি চলন বাঁকা। এখন প্রত্যেক কথা ও কাজে আমার দোষ বের হবে। তবুও ধৈর্য ধরতে হবে। যেহেতু ধৈর্যের ফল মিঠা হয়।

ছেলেবেলা থেকে ধৈর্যই তো ধরে আসছি। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পদাঘাত সহ্য করেছি, গায়ে বল-ওয়ালাদের আঘাত তো আজও নীরবে সহ্য করছি। তাছাড়া আর কিই-বা করতে পারি বল?

কিছু করতে পারলে এবং তা না করলে তবেই তো ধৈর্য হয়। কিন্তু 'আল্লাহুল মুস্তাআন' বিষকথা তো আর ভুলতে পারি না। মনের গহীন কোণে নীরবে তাঁর কাছে অভিযোগ করতে তো ছাড়ি না। ফরয নামাযের শেষাংশে, বিতরের কুনূতে ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ার সময় তো দুআ-বদ্দুআ বর্জন করতে পারি না।

মানুষ তো। ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে। মাঝ নদীতে লা ডুবলে দুঃখ নেই। কিন্তু লা যদি নদীর কিনারায় ডোবে, তাহলে কি বেশী দুঃখের কথা নয়?

পরের লাগানো আগুনে ঘর পুড়লে দুঃখ নেই। কিন্তু ঘরের চেরাগ দ্বারা ঘর পুড়লে কি বেশী আফসোসের কথা নয়? আমার যে দ্বিতীয় বারেও ঘরের চেরাগ দ্বারাই ঘর পুড়ে গেল!

'দিলকে ফফূলে জল উটঠে সীনে কে দাগ সে,
ইস ঘর কো আগ লাগ গয়ী ঘর কে চিরাগ সে।'

আমি জানি ভাই, প্রত্যেক মানুষের দুশমন থাকে। নবীদেরও দুশমন ছিল। নবীর ওয়ারেসদের তো থাকতেই পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا}

অর্থাৎ, এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম। তোমার

জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট। *(সূরা ফুরক্বান ৩১ আয়াত)*

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ } (١١٢)

অর্থাৎ, এরূপে আমি শয়তান মানব ও শয়তান জিনকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত ক'রে থাকে; যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা এ করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাকে পরিত্যাগ কর। *(সূরা আনআম ১১২ আয়াত)*

ঐ জ্বিনপুরী প্রেমনগরী বিনাশ পুরে আমার এত বড় বিনাশ ছিল, তা আমার জানা ছিল না।

হ্যাঁ, পরিত্যাগ করাই উত্তম। পরিহার করাই বেশী জ্ঞানের কাজ। পরিহার ক'রে চলাই আমার নীতি ছিল। কিন্তু আমি জড়িয়ে গেলাম ভুলক্রমে।

হক বয়ান ক'রে দেওয়া ওয়াজেব ছিল। কিন্তু পদ্ধতি ভুল ছিল। তার ফলে মকবুলের স্থানে মরফূয হয়ে গেছে।

তবুও তাতে পরিবারগত কোন খোঁচা নেই। তাতে কেবল নাম নিয়ে স্পষ্ট ভুলের কথা খুলে বলা আছে। সালাফী সাহেবের হুজ্জতে বায়ান প্রকাশ পেয়েছে। তিনি হুজুরদের ইল্‌ম নিয়ে সমালোচনা করেছেন, কারো বাপ-বউ নিয়ে নয়।

যে বুঝতে চায় না তাকে বুঝাবে কিভাবে? এক লোক এক সালিসি-সভায় ঘোষণা ক'রে বলল,

'আমাকে যে বুঝাতে পারে,
ঘর-সর্বস্ব দেব তারে।'

ভাড়াটিয়া ও চামচা লেখকদের মত কোন ব্যক্তি তাকে বুঝাবার দায়িত্ব গ্রহণ করল। ভয়ে তার ছোট মেয়ে কাঁদতে লাগল; বলল 'আব্বু! ও তোমাকে বুঝিয়ে দিলে, আমরা কোথায় গিয়ে বাস করব?'

আব্বু বলল, 'ধুৎ ক্ষেপী! কাঁদিস কেন? আমি বুঝলেই তো আমাদের ঘর-সর্বস্ব হারাতে হবে!'

যে বুঝ মনে ভিতরে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে গেছে, সে বুঝ পরিবর্তন করে কেবল উদার মনের মানুষরা। নচেৎ অন্যের মাকে না দেখেই নিজের মাকে বেশী সুন্দরী

ভাবে। অন্যের ভাষা না বুঝে নিজের ভাষাকেই বেশী সুন্দর বলে। অন্য আলেমকে না চিনে নিজের পরিচিত আলেমকেই বেশী বড় বলে জানে।

অথচ আমরাও তাঁদেরকে পরম শ্রদ্ধা করি। তাঁদেরকে প্রিয় বলে জানি, তবে হক আমাদের নিকট অধিক প্রিয়। ইমাম ইবনুল কাইয়েম (রাহিমাহুল্লাহ) শাইখুল ইসলাম ইসমাঈল আল-হারাবী প্রসঙ্গে বলেছিলেন,

شيخ الإسلام حبيب إلينا ، ولكن الحق أحب إلينا منه.

অর্থাৎ, শায়খুল ইসলাম আমাদের প্রিয় পাত্র; কিন্তু আমাদের নিকট 'হক' হল তাঁর চেয়েও বেশী প্রিয়। *(মাদারিজুস সালিকীন ২/৩৭)*

কিন্তু তাদের অবস্থা বলে, আরব দেশের আলেমরা আরবী ও কুরআন-হাদীস বুঝে না। আমার দেশের আলেমরাই বেশী আরবী ও কুরআন-হাদীস বুঝে! আমার দেশের অমুক অমুক সাহেব আলেম ছিলেন, তাঁরা গুজরে গেছেন, তাঁদের মত আর কি কেউ পয়দা হতে পারে?

যুগ কম্পিউটারের হল তো তাতে কি আসে-যায়? কুরআন-হাদীস তো আর নতুন হচ্ছে না। তাছাড়া সঊদী আরবের উলামাদের ফতোয়া মানবে কেন? সঊদী আরবে তো রাজতন্ত্র আছে! তাঁদের রাষ্ট্রনেতারা যে আমেরিকী সৈন্যকে স্থান দিয়ে রেখেছে!

আল-মাজমাআহ শহরের এক বিরোধী বাংলাদেশী ভাই আমার জন্য বলেছিলেন, 'ওর কথা কেন মানব? ওতো হিন্দু দেশের আলেম!'

কি অপূর্ব যুক্তি! অথবা খোঁড়া অজুহাত! কোন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে আলেম-উলামার সাথ কি?

ওঁরা বলেন, 'না, আলেমদের ফতোয়া মতেই আমেরিকী সৈন্য স্থান পেয়েছে।'

তাহলে আমরা বলব, 'একটা (বিতর্কিত) ফতোয়ার জন্যই কি তাঁদের সমস্ত ফতোয়া দুগ্ধে এক বিন্দু গোমূত্র পড়ার মত বাতিল হয়ে গেল?'

সুতরাং আমরা আমাদের দেশের যে মুহাদ্দিসদেরকে চিনি, তাঁদের সাথে কোন 'তাকাল্লুফ মুফতী' বা 'দাঁতফাড়া'কে নয়; বরং যদি আরবের কোন মুহাদ্দিসকে তুলনা করি, তাহলে এটা কি জরুরী নয় যে, তাঁকে আমরা বড়-ছোট যাই বলি, তাঁকে আগে চিনতে হবে? একজনকে চিনে এবং অপরজনকে না চিনে কি তুলনায় নিক্তির ওজন ঠিক রাখা যাবে? আমি আপনার মাকে না দেখেই যদি লোকেদের মত বলি, 'প্রত্যেকের মা নিজ নিজ সন্তানের কাছে সুন্দরী', তাহলে সেটা কি ইনসাফের কথা হবে? নিশ্চয় আসলে একজন এমন আছে, যে সবার চেয়ে বেশী সুন্দরী হবে। আর তা না দেখে, না জেনে তো কেউ বিচার করতে পারেন না।

পরন্তু কারোই অন্ধ-অনুকরণ বৈধ নয়। বিধেয় হল দলীল দেখে সত্যের অনুসরণ।

জনসাধারণের উচিত, স্থানীয় 'তাকাল্লুফ মুফতী' অন্য শব্দে 'ইল্‌মহীন মুফতী'দের অনুকরণ না করা। বিশ্ব আজ ছোট গ্রামে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বে---বিশেষ ক'রে মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র সঊদী আরবের মুফতীগণের অনুসরণে মুক্তির পথ রয়েছে। বিশেষতঃ শায়খ ইবনে বায, ইবনে উসাইমীন ও শায়খ আলবানী যে বিষয়ে একমত, সে বিষয়কে ধানাই-পানাই ক'রে উড়িয়ে দেওয়ার কি কোন যুক্তি থাকতে পারে?

যদি বলেন, তাহলে আমাদের দেশের আলেমরা কি আলেম নন? তবে আমরাও বলব, এ দেশের আলেমরা কি আলেম নন? জবাব আপনার কাছে।

সহীহ হাদীস দ্বারা আমল যথেষ্ট। সমস্ত সহীহ হাদীসই তো মানতে পারা যায় না, তাহলে যয়ীফ হাদীসের উপর আমলের প্রয়োজন কি? বলা বাহুল্য, যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা যাবে না। একটি শূন্যের পাশে আরো দশটি শূন্য বসালে কি কোন মান বাড়ে? দুর্বল অকর্মণ্য সন্তানের উপর কেউ কি সংসার ছাড়ে?

'সিহাহ সিত্তা' কথাটিও ঠিক নয়, সহীহায়ন ও সুনানে আরবাআহ বলা উচিত। কারণ, সহীহায়ন ছাড়া বাকী গ্রন্থগুলিতে যয়ীফ তথা জাল হাদীসও আছে, যা পরবর্তীকালের মুহাদ্দিসগণ চিহ্নিত করেছেন।

হাদীস কাকে বলে, তা কি আমরা বুঝি না? হাদীসের উপর আমল কখন করা যাবে সেটাও তো বুঝতে হবে।

১। যখন বুঝা যাবে যে, তার সনদ সহীহ অথবা হাসান।

২। যখন তার অর্থ সঠিকভাবে বুঝে আসবে।

৩। যখন জানা যাবে যে, তা মনসূখ নয়।

আর সোনার মদীনাকে ছোট ভাবছেন? মদীনা তো মদীনাই। মদীনা সম্বন্ধে মদীনা-ওয়ালাই বলেছেন,

(إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا).

অর্থাৎ, নিশ্চয় ঈমান মদীনার দিকে ফিরে আসবে, যেমন সাপ নিজ গর্তের দিকে ফিরে আসে। *(বুখারী-মুসলিম)*

এ প্রকৃতত্বই বুঝে সকলকে বুঝাতে চেয়েছি। কিন্তু মাদানীর ফতোয়া; আরে ধুৎ মাদানীর কেন হবে, প্রিয় মদীনার বড় বড় আলেমদের ফতোয়ায় অনেক হুজুরের স্বার্থে আঘাত লেগেছে।

আমি বিড়ি খাওয়া ও বাঁধা হারাম বলেছি, তাতে তাঁদের রাগ হতে পারে।

আমি গুল-জর্দা-গালি-তামাক হারাম বলেছি, তাতে তাঁদের রাগ হতে পারে।

আমি ব্যাংকের সূদ হারাম বলেছি, তাতে তাঁদের ক্ষোভ হতে পারে।

আমি দাড়ি ছাঁটা হারাম বলেছি, তাতে তাঁদের গায়ে জ্বালা ধরতে পারে।

আমি তাবীয ব্যবহার হারাম বলেছি, তাতে তাঁদের রাগ হতে পারে।

আমি দুআ বিদআত বলেছি, আরে না ফরয নামাযের পর হাত তুলে জামাআতী মুনাজাত বিদআত বলেছি, তাতে তাঁদের রাগ হতে পারে।

আমি কবরে পানি ছিটানো, আরে না কবর লোয়ানো বিদআত বলেছি, তাতে অনেক মওলানা ক্ষুব্ধ হতে পারেন।

আমি তাঁদের চিরাচরিত অনেক আমলকে বিদআত বলেছি, তাতে তাঁদের অসহ্য হওয়ার কথাই বটে।

কিন্তু তাতে আমার দোষ কি? তাতে আমার সাথে তাঁদের দুশমনিই বা কেন হবে? হককে কি হক বলে প্রচার করাও দোষ?

কেউ কেউ উদার মনে মেনে নেন। সত্য গ্রহণ ক'রে তার প্রচারে সহযোগিতা করেন। আমাকে নিয়ে গর্ব করেন।

কেউ মেনে নেন; কিন্তু সত্য প্রকাশ ও প্রচার করতে উদ্বুদ্ধ হন না এবং সহযোগিতাও করেন না।

কেউ কেউ মানেন না। সহযোগিতাও করেন না। কিন্তু সামনে আমার তারীফ করেন। আর সহযোগিতা চাইলে পিছনে বলেন, 'যে পোলাও খেতে পায়, সে করুক!' এরা আসলে দু'দলের মাদল।

কেউ কেউ মানেন না, উল্টে বিরোধিতা করেন। কলঙ্ক রচনা ক'রে রটনা করেন, যাতে আমার সচল চাকা অচল হয়ে যায়!

কবি বলেন,

وَلَمَّا أَتَيْتُ النَّاسَ أَطْلُبُ عِنْدَهُمْ   أخا ثقةٍ عند ابتلاء الشدائد

تقلبتُ في دهري رخاءً وشدَّةً   وناديتُ في الأحياء هل من مساعد؟

فلم أرَ فيما ساءني غير شامت   وَلَمْ أَرَ فِيما سَرَّنِي غَيْرَ حاسِدِ

অর্থাৎ, 'যখন আমি মানুষকে পরীক্ষা করলাম,
বিপদের সময় একজন নির্ভরযোগ্য ভাই চাইলাম।
সুখে ও দুঃখে উভয় অবস্থায় আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম;
জীবিতদের মাঝে ডাক দিলাম, কোন সহায়ক আছে কি?

কিন্তু আমার বিপদের সময় হাস্যকারী ছাড়া---
এবং আমার আনন্দে হিংসুক ছাড়া আর কাউকে দেখলাম না।’

{فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (٦٤) سورة يوسف

۞ অপবাদ দেওয়ার কারণ

আমি ‘আরণ্যক দাবানলের মত জ্বলে’ উঠে তাঁর অপমান করেছি। আমি তাঁর ভুল ধরেছি। আমি ছোট হয়ে বড়র প্রতি কটাক্ষ করেছি।

অথচ তিনিই এই সিলসিলাহ প্রথম সৃষ্টি করেছেন। তিনিই প্রথমে বই লিখে আকারে-ইঙ্গিতে আমাদের প্রতি **‘আবু জেহেল, মূর্খ, ফিতনাসৃষ্টিকারী, বিদআতী, ক্বাদারী, বিপথগামী এমং মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্তকারী’** ইত্যাদি বলে কটাক্ষ হেনেছেন।

শায়খুল হাদীস মওলানা আব্দুর রউফ শামীম সাহেব, তারই খন্ডন করতে উৎসাহিত করেন, ভুল ভাঙ্গতে আদেশ করেন। তাছাড়া ঐ বইয়ে এ কথাও ছিল যে, সঠিক দলীল পেশ করতে পারলে তা মেনে নেওয়া হবে।

আমি লিখলে সরাসরি বেআদবী হয়ে যায়---এই আশংকায় তিনি মুহতারাম সালাফী সাহেবকে এই দায়িত্ব দিতে বলেন। আমি তথ্য যোগাই। জবাব লেখা হয়। তিনি সরাসরি নাম নিয়ে দস্তুরমত অপবাদসমূহের খন্ডন করেন। সালাফী সাহেব আমার বইয়ের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করেছেন, তিনি ভূমিকাতে তা বলেই দিয়েছেন।

কিন্তু এর জবাবে বই লেখা হয়। প্রথমোক্ত বইয়ের মাসায়েলের পুনরাবৃত্তি সহ সংযোজনে সালাফী সাহেব ও আমার নাম ধরে এবং আমার শ্বশুর-বাড়ির আরো অনেককে আভাষে-ইঙ্গিতে খোঁচা দেওয়া হয়। বই গ্রামে গ্রামে ফেরি ক’রে বিক্রি করা হয়। আমার গ্রামে গিয়ে আমাকে দেওয়া অপবাদ আমারই ভাইকে কুড়ি টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হয়! পবিত্র হজ্জেও বই বিতরণ হয়।

একদিন আমার উস্তাদতুল্য মাষ্টার দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম দুই মাদ্রাসার সভাপতি সাহেবকে টেলিফোন করলে তিনিও কাদাছুঁড়া ঐ বইয়ের নিন্দা করেন।

অনেকে সে বই পড়ে হাসে। অনেকে প্রতিবাদ করে। আমি সরাসরি প্রকাশককে টেলিফোন করি। তিনি জানান, তাঁর নাম এমনিই দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি এ সম্বন্ধে কিছু জানেন না। তিনি অবশ্য লেখককে জানিয়ে ‘ছিঃছিঃ’ করলে, লেখক নাকি বলেছেন, যা লিখেছেন তার সবটাই বাস্তব!

সুতরাং সেই বাস্তবতার 'কুলের কথা খুলে' লিখতে সমাজের কাছে আমাদের এই আর্তির প্রকাশ। যাতে ভুল বুঝার শিকার হয়ে লেখকের মত অপবাদের গোনাহর শিকার না হয়ে বসেন।

লেখককে সরাসরি চিঠি লিখি। সেই চিঠি জিদ্দায় কর্মরত জামাইদের হাতে পৌঁছে দিই। যাতে তিনি হজ্জ করতে এসে হাতে পান। প্রকাশক সংস্থা আঞ্জুমান ইসলাহুল মুসলিমীনের নিকটেও ইফসাদুল মুসলিমীনের ভূমিকা বর্জন করতে আর্জি জানিয়ে আবেদনপত্র পাঠানো হয়। প্রবাসী ভাইদের পক্ষ থেকে পাণ্ডুয়ার ওয়েল-ফেয়ার সোসাইটির লেটারপ্যাডেও একটি প্রতিবাদ-নামা প্রেরণ করা হয়।

এ কাজে---বিশেষ ক'রে শত শত হারাম-হালাল-ফরয বাদ দিয়ে একটি বিতর্কিত জায়েয বা বিদআত আমলকে কেন্দ্র ক'রে---সময় ব্যয় তথা রিষারিষি আমাদের বাঞ্ছনীয় ছিল না। কিন্তু মাথা ফাটানো হয়েছে বলে চুনের খোঁজে খামাখা অযথা হয়রানি বরণ করতে হচ্ছে। আশা করি, এতে অনেকের জন্য শিক্ষাও আছে।

আরো আশা করি, সমাজের মানুষ আমাদেরকে অপরাধী করবেন না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

(الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِئِ مِنهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ).

অর্থাৎ, দুই গালমন্দকারী যা বলে, তা তাদের মধ্যে আরম্ভকারীর উপর বর্তায়; যদি না মযলূম সীমালংঘন করে। *(মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী)*

আর দুআর পক্ষপাতীরাই আগে গালাগালি শুরু করেছে; যেমনটি আগে উল্লেখ করেছি। বিনা দোষে কেউ অপরকে লানতান করলে, তা নিজের ওপরেই এসে বর্তাবে---এ কথা বলেছেন খোদ আমাদের নবী ﷺ। তিনি বলেছেন, "বান্দা যখন কোন কিছুকে অভিশাপ করে, তখন অভিশাপ আকাশের প্রতি উঠে যায়, কিন্তু তাকে বাইরে রেখেই আকাশের দ্বারসমূহ বন্ধ করা হয়। অতঃপর তা পৃথিবীর দিকে অবতরণ করে। কিন্তু তাকে বাইরে রেখেই পৃথিবীর দ্বারসমূহও বন্ধ করা হয়। অতঃপর ডানে বামে ফিরতে থাকে, পরিশেষে যখন তা কোন যথার্থ স্থান না পায়, তখন অভিশপ্ত বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি ফিরে যায়, যদি সে এর (অভিশাপের) উপযুক্ত হয়, তাহলে (তাকে অভিশাপ লেগে যায়)। নচেৎ অভিশাপকারীর নিকট তা প্রত্যাবৃত্ত হয়।" *(সহীহুল জামে ৮৮৫নং)*

এ তো সেই লানতান, যা মুখে করা হয়। পক্ষান্তরে যা বইয়ে লিখে করা হয়, যা যুগ যুগ ধরে থেকে যায়, তার কি হবে?

অপবাদ অপনোদন

১। আমি নাকি আমার নিজের বাপকে বাপ বলিনি! পরের বাপকে বাপ বলি!

এটি একটি সফেদ ঝুট। আমার আব্বা মারা গেছেন ২০০০ সালের ৯ই মার্চ। সংসার ও পরিবারের বিশেষ ক'রে মহিলা-মহলে কলহ বাধে ১৯৯৬ সালে। আমার গ্রামের সকলেই জানে এবং বর্তমানে আমার মা-ভাইরা সকলে জানে যে, আমার বাপের সাথে এমন কিছু হয়নি, যার ফলে আমি বাপকে বাপ বলিনি। এতবড় একটা মিথ্যা কথা কার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তা আমার চাচাই জানেন। এই বলে গালি দেওয়া তাঁর স্বার্থের অনুকূলে মোটেই নয়। কারণ এটা তো হজম করা যাবে না। যেহেতু তাঁর বিপক্ষে শত-শত সাক্ষ্য মিলবে, সকলেই বলবে, উক্ত কথাটি ডাঁহা মিথ্যা ও স্পষ্ট অপবাদ। কারো কাছে শুনে বলেছেন? তা ঠিক আছে। কিন্তু শোনা কথা বুলেট হিসাবে ব্যবহার করার আগে তো প্রয়োজন ছিল আল্লাহর নির্দেশ মান্য ক'রে তা যাচাই ক'রে দেখে নেওয়ার। নচেৎ এ ভয় কি তাঁর ছিল না যে, তিনি মহানবী ﷺ-এর সেই বাণীতে শামিল হয়ে যাবেন, যাতে তিনি বলেছেন,

(كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ). رواه مسلم

অর্থাৎ, মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তার প্রত্যেকটাই বয়ান করে। *(মুসলিম)*

আর পরের বাপকে বাপ বলা, অর্থাৎ শ্বশুর-আব্বাকে 'বাপ' বলায় দোষ কি আছে? এ কথা সমাজে দূষণীয়, নাকি শরীয়তে পাপ?

পক্ষান্তরে যদি "যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।"---এই হাদীস থেকে ঐ ফতোয়া নিয়ে আমার দোষ ধরে খামাখা গালি দিয়ে থাকেন, তাহলে 'ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন।'

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

আর যদি তাঁর এ কথায় উদ্দেশ্য হয়, 'আলিফ নগরী, বর্ধমানী, পশ্চিমবঙ্গী বা ভারতী' না লিখে 'মাদানী' লেখা, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু 'বলে নাই' কথায়

পূর্বোক্ত মিথ্যাই ইঙ্গিত করে।

২। আমি একজন ভাড়াটিয়া লেখক!

এ অপবাদটি তখন 'বাস্তব' রূপ পাবে, যখন চাচাজী প্রমাণ করতে পারবেন যে, আমি ডলার বা রিয়ালের বিনিময়ে বই লিখি।

অথবা আমি আরবে আসার পর আরবের রিয়াল খেয়ে তাঁদের সনাতন ইসলামের বিরুদ্ধে বই লিখতে শুরু করেছি। কারণ, সঊদী আরবের ইসলাম তাঁদের মনঃপূত নয়।

অথবা আমি যে চাকরীর বিনিময়ে বেতন পাই, তা আমার লেখারই ভাড়ামাত্র।

আর প্রমাণ করতে না পারলে এটিও ঝালঝাড়া মিথ্যা কথা।

অথচ আমার বন্ধু-বান্ধব সহ অনেক ওস্তাদই জানেন এবং সমাজের অনেকেই সাক্ষী আছে যে, আমি ছাত্র জীবন থেকেই লেখালেখি করি। কারো ভাড়া খেটে লিখি না। যা সত্য মনে করি, তাই লিখি, তাই বলি। আমি নিজের পয়সায় বই ছাপি না। সমাজের গুণগ্রাহী মানুষরাই আমার বই ছাপতে আগ্রহ প্রকাশ করে। আমি বিনা মূল্যে ছাপার অনুমতি দিই। আমার অফিস লেখা বাবদ কোন বিনিময় দেয় না। পুবার-পিচকুরির মাদ্রাসায় বই ছাপা ও বিক্রয়ের পর আমার কোন পারসেন্টেজ নেই। কাটিহার ও বাংলাদেশে আমার অনেক বই ছাপা হয়েছে। সেখান হতেও আমি কিছু পাই না। তাহলে কেন এ অপবাদ? 'গাড়ি-গাড়ি বই লিখেছে' বলেই কি ভাড়াটিয়া লেখক? নাকি তাঁদের বিরোধীদের পক্ষালম্বন ক'রে লিখি বলে ভাড়াটিয়া?

এ বিচারভার রইল আল্লাহর উপর, অতঃপর সমাজের উপর, যে সমাজ আমাকে চেনে, আমার লেখা পড়ে ও তার মূল্যায়ন করে।

৩। আমি 'স্বীয় ভার্জার' (ভার্যার অর্থাৎ, লেখকের ভাইঝির) পৃষ্ঠদেশে পরপুরুষ দ্বারা কংস থালা স্থাপনকারী।

মনে হয় ১০/১২ বছর আগের কথা। আমি আছি পিচকুরির মাদ্রাসায় মাদ্রাসার কাজে। সকালে মুসলেহুদ্দীন বুখারী পুরন্দরপুর থেকে মাদ্রাসায় টেলিফোন করে--- 'বুবুকে সাপে কামড়ে দিয়েছে, বাড়িতে আসুন!'

বর্তমানে লেখকের মেয়ে যে রুমটিতে বাস করে, সেই রুমটির দরজার দু'দিকে আমাদেরই আলমারী রাখা ছিল। ফজরের নামায পড়তে উঠে চৌকাঠের নিচে পা রাখতে এক আলমারীর নিচে থেকে কোন জন্তুতে দংশন করে। কেউ বলে সাপ, কেউ বলে কোন বিষাক্ত পোকা। বেলা উঠতে গায়ে বড় বড় চাকা-চাকা দাগ ওঠে।

পা ফুলে মোটা হয়ে যায়। পাড়া-গাঁয়ের নানা মহিলা-পুরুষের পরামর্শমতে বিষ ঝাড়তে নিয়ে যান লেখকেরই ভাই-ভাবী সহ আরো কতক আত্মীয়-স্বজন। লেখক বা তাঁর একান্ত আপন কেউ সাথে গিয়েছিলেন কি না, তা আমার জানা নেই। আমি যখন অবিনাশপুর ফিরে আসি, তখন দেখি, তাঁদের কেউ নেই বাড়িতে। সকলে ফিরে আসলে জানতে পারি, গাড়ি ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কোন ওঝার কাছে। সে নাকি কাঁসের থালা পড়ে বিষ নামাতে জানে।

লেখক বহু খোঁজাখুঁজির পর আমার মহাদোষ হিসাবে ঐ ঘটনাকেই খুঁজে পেয়েছেন এবং তাই দিয়ে আমার 'ঘোমটার ভিতরে খেমটার নাচ' দেখতে পেয়েছেন! (সঠিক অর্থে শুনতে পেয়েছেন!) আর সেই নাচ দেখিয়ে আমাকে সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। 'এত বড় আলেম তো পরপুরুষ দিয়ে স্ত্রীর পিঠে কাঁসের থালা বসালো কেন? এ কেমন মুসলমান (?) গো?'

কিন্তু জনাব! আমি তো ঐ পুতুল-নাচের মঞ্চেই ছিলাম না। বৈধাবৈধ যাই হোক, ঐ চিকিৎসার পরামর্শদাতাও আমি নই। মেয়েরা বাপের বাড়িতে থাকলে বাপ-চাচার দায়িত্বেই থাকে। তাহলে আমার দোষ হল কোত্থেকে? এটা কি উপর দিকে থুথু ফেলে নিজের গায়ে নেওয়া নয়? চাচাজীর স্মরণ থেকে হয়তো খোওয়া গেছে যে, জামাই সে সময় বেটির পাশেই ছিল না।

তাছাড়া সাপে-কাটা রোগীকে বাঁচাতে মানুষ কি না করে? মরণোন্মুখ মহিলা রোগীর চিকিৎসার সময় দেখা হয় না যে, ডাক্তার পর-পুরুষ, না ঘর-পুরুষ। চিকিৎসার সময় পিঠে 'কংস থালা' তো দূরের কথা, গুপ্তাঙ্গে হাত পর্যন্ত দেওয়া হয়। কিন্তু তা ধরেও কি মানুষ তার দুশমনকে খোঁচা দেয়?

এই হল বাস্তব। ফতহুল বারীর হাওয়ালা ছেড়ে ফতহুল বাড়ির কথার হাওয়ালায় আমাকে 'ডাউন' করার ইচ্ছা আর কি! বাকী বিচারভার রইল ন্যায়পরায়ণ সমাজের উপর।

৪। আমি 'মাদানী' লিখে গর্ব করি।

'মাদানী' লিখলে অনেকেরই পিত্তি জ্বলে ওঠে। কারণ এ নামে সবার চেয়ে বেশী সম্মান রয়েছে তাদেরই ধারণায়। তাছাড়া গা জ্বলবে কেন? হিংসার ক্ষতে মরিচ-বাঁটা পড়বে কেন?

অনেকে মনে করে, মাদানীরা 'মাদানী' লিখে 'ইল্মী গুমর' প্রকাশ করে।

অথচ আমাদের নিকট পরিচয়ের জন্য এবং সাধারণ মানুষের মনে গ্রন্থের আকর্ষণ

বৃদ্ধি করার জন্য উপাধি বা ডিগ্রী লাগাতে দোষ নেই। 'মেড ইন জাপান' অথবা 'মেড ইন চায়না' দেখে যেমন পণ্যের মান নির্ণয় করতে সহজ হয়। যোগ্য ডাক্তার হলেও অজানা লোকে ডিগ্রী দেখে। খেজুর মার্কেটে দেখেছি, প্যাকেটের উপর تمـــر المدينـــة লিখা থাকলে, তা শ্রেষ্ঠ খেজুর বলে বিক্রি হয়। তেমনি মানুষ আলেমদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মান লক্ষ্য করে ইল্‌ম গ্রহণ ক'রে থাকে। আর তাতে শরয়ী কোন ক্ষতিও নেই। অহংকার বা রিয়া তো মনের ব্যাপার। কারো হলে হতে পারে। আল্লাহ তার হিসাবগ্রহণকারী। আমি নিজের কথা বলি, আমার বইকে অধিক নির্ভরযোগ্য করার জন্য 'মাদানী' জুড়ি। সঊদী আরবে 'ফাইযী' জুড়ি। এ ব্যাপারে অনেক ভাইয়ের পরামর্শও তাই। দাওয়াতি স্বার্থেই তা কাজে লাগে।

ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه.

পক্ষান্তরে যদি কেউ নিজের নামের সাথে লকবের লেজুড় না জুড়ে, তাহলে সেটা তার অধিক বিনয়ের পরিচয় বলতে হবে। কিন্তু পরিচয়ের জন্য মনে অহংকার না রেখে যদি কেউ লেখে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও কি অহংকারে ফতোয়া প্রয়োগ হবে? পরিচয়ের জন্য কাউকে আমীরুল মু'মিনীন, ইমাম, মুহাদ্দিস, শায়খ, হাফেয, মাষ্টার, মাদানী, ফাইযী, শামসী, আলিয়াবী বলে উল্লেখ করলেই কি মানুষের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, ইল্‌মী অহংকারের গুমর প্রকাশ করা হয়? 'রিয়াযী' লিখলেই কি 'রিয়াজী' হয়? তাছাড়া এসব তো মনের ব্যাপার। শুধু কি লেখাই দেখবেন, মনের খবর নেবেন না?

'শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা,
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা?'

পক্ষান্তরে যাঁদের গায়ে জ্বালা ধরে, তাঁরাও তো একাধিক লকবের লেজুড় জুড়েন। প্রয়োজনে জুড়ার দরকারও আছে; নচেৎ মানুষ তো আর অপরিচিত সাধারণ মানুষের লেখা বই পড়বে না।

আমি যদি 'আব্দুল হামীদ আলিফনগরী' লিখতাম, তাহলে লোকে কিভাবে জানত যে, আমি চাষী, ব্যবসায়ী, মাষ্টার না অন্য কিছু? আর আলেফ নগরকেই বা কতজন চেনে?

পক্ষান্তরে মাদানীদের 'মাদানী' লেখার একটা সূত্র আছে। মদীনা নববিয়ার মাটিতে হাবীবের শহরে চার বা তারও অধিক বছর যাঁরা কাটিয়েছেন, তাঁদের জন্য 'মাদানী' লেখা দূষণীয় নয়। উলামাগণ বলেন,

إن الإنسان إذا كان في بلد فاستوطنها ـــ بعض العلماء يقول ـــ أربع ســـنوات اســـتوطنها فإنه يصح النسبة إليها، فإذا كثر استيطانه للبلدان يصح أن نطلق عليه عدة أنساب، مثلا عـــاش في نجد ولد في نجد ومكث فيها فترة ثم انتقل إلى المدينة ثم انتقل إلى اليمن ثم انتقل إلى الشام ثم انتقل إلى مصر هذا تقول فلان النجدي المدني اليمني الشامي المصري ويصح ـــ يقولون الأولى ـــ أن تقول: النجدي ثم المدني ثم اليمني ثم الدمشقي ثم المصري....

অর্থাৎ, মানুষ যখন কোন শহরের বাসিন্দা হয়---কিছু উলামা বলেন, চার বছর বাস করে---তখন তার দিকে নিসবত (সম্পর্ক) জুড়া শুদ্ধ। একাধিক শহরে তার বসবাস হলে একাধিক নিসবত জুড়া আমাদের জন্য শুদ্ধ। যেমন কেউ নজদে জীবনধারণ করল, নজদে জন্মগ্রহণ করল, সেখানে কিছুকাল অবস্থান করল, অতঃপর মদীনায় স্থানান্তরিত হল, অতঃপর ইয়ামানে স্থানান্তরিত হল, অতঃপর শামে স্থানান্তরিত হল, অতঃপর মিসরে স্থানান্তরিত হল। এর জন্য বলবেন যে, অমুক নাজদী, মাদানী, ইয়ামানী, শামী, মিসরী। অবশ্য সঠিক এই যে---তাঁরা বলেন, উত্তম এই যে, আপনি বলবেন, অমুক নাজদী, সুম্মা মাদানী, সুম্মা ইয়ামানী, সুম্মা শামী, সুম্মা মিসরী।..... *(শারহুত তাযকিরাহ ফী উলূমিল হাদীস, ইবনুল মুলাক্কিন ১/ ১২৮)*

পরন্তু দেশ-প্রীতি কার বা নেই? মায়ের মাটির মায়া যে কত, তা তো আমার মত প্রবাসীরাই জানে। নিজের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গ, নিজের দেশ ভারত---তা বলতে জিবে জড়তা আসবে কেন ছাই? জন্মভূমি মনে রেখে 'মাদানী' নামে পরিচিতি দিলে দোষ কোথায়?

দেশ আমার দেশ, যাতে আমার মত হতভাগা জন্ম নিয়েছে। আর সে দেশ---যে দেশের নামে আমি পরিচিতি দিই---সে দেশ আমার হাবীবের দেশ, সে দেশে আমার প্রিয়তম জন্ম নিয়েছেন, তার মাটিতে তিনি শুয়ে আছেন। ফিদাহু আবী অউম্মী। আমার মা-বাপ তাঁর জন্য কুরবান হোক। আমার দেশ, জাতি ও জন্মভূমি তাঁর জন্য কুরবান হোক। অবশ্যই আমার কাছে; বরং সারা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে আপন আপন মাতৃভূমি অপেক্ষা তাদের প্রিয় হাবীবের দেশই বেশি উত্তম। সেই পরম প্রিয় ভক্তিভাজনের দেশকে অপেক্ষাকৃত বেশি ভালবেসে যদি আমি আমার পরিচিতি দিই, তাতে কি হিংসুক ছাড়া আর কারো ক্ষতি থাকতে পারে?

আসলে নিজের অন্তর পরিষ্কার রাখলে, পরের নাম বিচার করতে কেউ যায় না। আর মনের ভিতরে হিংসার আগুন না থাকলে পরের ভাল নামে কেউ বেগুন-পোড়া খায় না।

আল্লাহ সকলকে সুমতি দিন। আমীন।

“মদিনায় যাবি কে আয় আয়
উড়িল নিশান, দীনের বিষাণ
বাজিল যাহার দরওয়াজায়।
হিজরত ক’রে যে দেশে
ঠাঁই পেলেন হজরত এসে,
খেলিতেন যথায় হেসে
হাসান হোসেন ফাতেমায়।।
হজরতের চার আসহাব যথায় করলেন খেলাফত,
মসজিদে যাঁর প্রিয় মোহাম্মদ করতেন এবাদত,
ফুট্‌ল যেথায় প্রথম বীর খালেদের হিম্মত,
খোশ-এলাহানে দিতেন আজান বেলাল যেথায়।।
যা’র পথের ধুলির মাঝে
নবীজির চরণের ছোঁওয়া রাজে,
তৌহীদেরই ধ্বনি বাজে
যার আসমানে, যার ‘লু’ হাওয়ায়।।”

বিঃদ্রঃ এই পুস্তিকা সহ আব্দুল হামীদ মাদানীর আরো পঞ্চাশাধিক বই-পুস্তিকা ও তফসীর আহসানুল বায়ান ইন্টারনেটে পড়ুন ঃ-
www.abdulhamid-alfaidi-almadani.webs.com